POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا
وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○ (المائدہ:70)

নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহারা ইহুদী হইয়াছে তাহারা এবং সাবীগণ এবং খৃষ্টানগণ- যে কেহ ঈমান আনে আল্লাহ্‌র উপর এবং পরকালের উপর এবং সৎকর্ম করে, না তাহাদের কোন ভয় থাকিবে এবং না তাহারা দুঃখিত হইবে। (আল মায়েদা: ৭০)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 9

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 22

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 30 May, 2024 12 জুল কাআদা 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

যথাস্থানে সম্পদ খরচ করার এবং অপরকে শেখানোর শ্রেষ্ঠত্ব।

১৪০৯) হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)–এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, 'আমি নবী (সা.) কে একথা বলতে শুনেছি: ঈর্ষা করা উচিত নয়, কিন্তু কেবল দুই (ব্যক্তি)–এর উপর ভিন্ন। এক, সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা'লা সম্পদ দান করেছেন আর তাকে সেই সম্পদ যথাস্থানে খরচ করার তৌফিক দান করেছেন। দ্বিতীয়, সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ তা'লা সঠিক জ্ঞান দান করেছেন আর সে নিজেও সেই জ্ঞান বাস্তবায়িত করে আর লোককেও শেখায়।

১৪১১) হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)–এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে; নবী (সা.) যখন আমাদেরকে সদকা করার আদেশ দিতেন, তখন আমাদের মধ্যে কেউ বাজারে গিয়ে সেখানে মুটের কাজ করে এক 'মুদ' অর্জন করত, আর এমন অবস্থা যে তাদের অনেকের কাছে এক লক্ষ করে (দিনার) আছে।

১৪১৭) হযরত আদ্দি বিন হাতিম (রা.) বর্ণনা করেন, 'আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.) কে বলতে শুনেছি, 'আগুন থেকে রক্ষা পাও, এক টুকরো খেজুর দানের মাধ্যমে হলেও।

পবিত্র সম্পদ থেকে সদকা দান করো।

১৪১০) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)–এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন, যে –ব্যক্তি পবিত্র (সৎ) উপার্জন থেকে খেজুর তুল্যও সদকা করে, আর আল্লাহ্ পবিত্র বস্তুকেই গ্রহণ করেন, আল্লাহ্ সেই সদকাকে ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি সদকা প্রদানকারীর জন্য তা বৃদ্ধি করেন। ঠিক সেই ভাবে যেভাবে তোমাদের মধ্যে কেউ নিজের বাছুর পোষে। আর ক্রমেই তা (সদকা) পর্বত সমান হয়ে যায়।

(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড)

খোদা তা'লার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ ও আওয়লিয়াদের বিরোধিতা এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার পরিণাম কখনও ভাল হতে পারে না। যে ব্যক্তি মনে করে, সে তার উপর অত্যাচার করে, তাকে কষ্ট দেওয়ার পরও সুখ লাভ করতে পারে, সে চরম বিভ্রান্তিতে আছে, সে আত্ম প্রবঞ্চনার শিকার।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর পবিত্র বাণী

যখন কেউ কাউকে ভালবাসে, যেভাবে কেউ নিজ সন্তানকে ভালবাসে, আর অপর এক ব্যক্তি যদি বার বার একথা বলে যে, 'এই ছেলেটি মরে যাক' বা তার সম্পর্কে অন্য কোন মর্মপীড়াদায়ক কথা বলে, তাকে কষ্ট দেয়, তবে সেই ব্যক্তিকে কেউ–ই পছন্দ করবেনা, এটিই তো নিয়ম। একজন পিতা কিভাবে এমন ব্যক্তিকে ভালবাসতে পারে, যে কিনা তার সন্তানকে অভিশাপ দেয় বা তার জন্য পীড়াদায়ক বলে? অনুরূপভাবে আওলিয়ারাও আল্লাহ্‌র সন্তানের ন্যায়, কেননা তারা দৈহিক সাবালকত্বের আবরণ ছেড়ে বেরিয়ে এসে আল্লাহ্‌র সমীপে পূর্ণরূপে সমর্পণ করেছে তাঁর কৃপা–ক্রোড়ে বিকশিত হতে। তিনি তাদের অভিভাবক, তত্ত্বাবধায়ক এবং তাদের জন্য আত্মাভিমান পোষণকারী। যখন কোন ব্যক্তি– সে যে ভাবেই নামায পড়ুক বা রোযা রাখুক– তাদের বিরোধিতা করে এবং কষ্ট দেওয়ার জন্য কোমর বেঁধে লাগে, তখন আল্লাহ্ তা'লার আত্মাভিমান জেগে উঠে এবং বিরোধিতাকারীদের উপর তাঁর ক্রোধ নেমে আসে। কেননা, তারা তাঁর এক প্রিয়ভাজনকে কষ্ট দিতে চেয়েছে। সেই সময় নামায রোযা কিছুই কাজে আসে না। কেননা নামায ও রোযার মাধ্যমে সেই সত্তাকেই তো প্রীত করার বাসনা ছিল যাঁকে তার অন্য একটি কাজ অসন্তুষ্ট করে তুলেছে। তাই সেই সন্তুষ্টির মর্যাদা কিভাবে লাভ হওয়া সম্ভব, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐশী ক্রোধ দূর না হয়? আর নির্বোধরা এই ক্রোধের কারণ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। তারা তো নিজেদের নামায রোযা নিয়ে এক প্রকার গর্বিত থাকে। পরিণামে খোদা তা'লার ক্রোধ ক্রমশ বৃদ্ধি পায়, আর তারা খোদার নৈকট্য লাভের পরিবর্তে তাঁর থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। অবশেষে এমন ব্যক্তিরা উর্ধ্বলোকে সম্পূর্ণরূপে অভিশপ্ত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি একেবারে আত্মবিলীনতার অবস্থায় রয়েছে এবং খোদার দরবারে নিজেকে সঁপে দিয়েছে এবং প্রতিপালকের আশ্রয়ে লালিত হচ্ছে এবং খোদার কৃপা তাকে পরিবেষ্টন করে আছে, এমনকি তার কথা বলা যেন খোদার কথা বলা, তার বন্ধু খোদার বন্ধু এবং তার শত্রু খোদার শত্রু– কাজেই খোদার শত্রু হয়েও কি কোন ব্যক্তি পূর্ণ মোমেন হতে পারে? এভাবে তার ঈমান হানি হয় এবং সে খোদার অভিশপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়। খোদা তা'লার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ ও আওয়লিয়াদের বিরোধিতা এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার পরিণাম কখনও ভাল হতে পারে না। যে ব্যক্তি মনে করে, সে তার উপর অত্যাচার করে, তাকে কষ্ট দেওয়ার পরও সুখ লাভ করতে পারে, সে চরম বিভ্রান্তিতে আছে, সে আত্ম প্রবঞ্চনার শিকার।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩১৪)

খোদার কৃপায় নবীরা নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। তবে নবী যে বলছেন 'আমাকে ক্ষমা কর'– এর অর্থ কি? মোমেনের বিভিন্ন পদমর্যাদা অনুসারে 'ইগফিরলি–' এর বিভিন্ন অর্থ।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা ইব্রাহিমের ৪২ নং আয়াত رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ এর ব্যাখ্যায় বলেন–

খোদার কৃপায় নবীরা নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। তবে নবী যে বলছেন 'আমাকে ক্ষমা কর'– এর অর্থ কি? আসলে সেই সব ব্যক্তির দৃষ্টি অত্যন্ত সীমিত, যারা খোদা তা'লার পরিচয় লাভ থেকে বঞ্চিত। এমন ব্যক্তির দৃষ্টি মানুষ পর্যন্ত যায়, মানুষকে দেখেই সন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু খোদার পরিচয় লাভকারী ব্যক্তির দৃষ্টি উর্ধ্বলোক পর্যন্ত বিস্তৃত। সে উপলব্ধি করে নেয় যে আল্লাহ্‌র সামনে বান্দার কোন অস্তিত্বই নেই। সূর্যের সামনে একটি ধূলিকণার কি মূল্য আছে? কেননা মানুষ তো তাঁরই সৃষ্টি। তার জীবনও খোদার তা'লার দান। আর হিদায়তও তাঁর পক্ষ থেকে আসে। গালিব কি চমৎকার কথা বলেছেন–

'জান দি , দি হুই উসি কি থি,
হক তো ইয়ে হ্যায় কি হক আদা না হুয়া।'

(ভাবার্থ– খোদার সমীপে প্রাণ বিজর্সন দিলাম ঠিকই, কিন্তু সেই প্রাণও তো তাঁরই গচ্ছিত ধন ছিল। সত্য এই যে, আমি এই ঋণ পুরোপুরি শোধ করতে ব্যর্থ হলাম)

তাই নবী যেহেতু খোদার পরিচয় লাভকারী হয়ে থাকে, সে নিজেকে দেখে এবং উপলব্ধি করে যে, যা কিছু সে করছে, তা সে নয় বরং খোদা স্বয়ং করছেন। এই কারণে নবী দোয়া করে, 'হে আল্লাহ্ আমার সত্তাকে যতটা সম্ভব গোপন রাখ এবং নিজেকে যতবেশি সম্ভব প্রকাশ কর। অর্থাৎ এক্ষেত্রে 'ইগফিরলি' (আমাকে ক্ষমা কর)–এর অর্থ

এরপর শেষের পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

মৌলিক ধর্মতত্ত্ব ও এর খুঁটিনাটি

‘নামাযের সময় কুরআন তিলাওয়াতকারী দেখে পড়া বা শ্রবণকারীর দেখে লুকমা দেওয়ার বিষয়ে আমার মতে ইমাম আবু হানিফার মতবাদই সঠিক।

এগুলি সব আধ্যাত্মিক ও রূপক কথাবার্তা। ইহজগতের জীবনাবসানের পর আল্লাহ্‌র নিকট শাস্তি ও পুরস্কারের জন্য মানুষ যখন উপস্থিত হবে, তখন এগুলি প্রকাশ পাবে। আর পরকালে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রাপ্য পুরস্কার ও প্রতিদানের অশেষ ভাণ্ডার, সেগুলির গুরুত্ব, অনুরূপভাবে এই জগতের অপকর্মসমূহের পরিণামে পরকালের জীবনে প্রাপ্য শাস্তির তীব্রতা প্রকাশ করতে এবং মানুষের মধ্যে সেই কষ্ট ও যন্ত্রণার অনুভূতি তৈরী করতে এই ধরণের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে

প্রশ্ন: মিশরের জনৈক আহমদী হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নিকট তারাবিহ নামাযে হাফিজ নয় এমন ব্যক্তির কুরআন দেখে ‘লুকমা’ (তিলাওয়াত ভুলে গেলে ধরিয়ে দেওয়া) প্রসঙ্গে ‘ফিকহুল মসীহ’ - এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন,‘বুঝতে পারছি না এভাবে কি করে নামায পড়া যায়?

উত্তর : রমযান শরিফে তারাবিহ নামাযের জন্য হাফিজ নয় এমন কোন ব্যক্তির কুরআন দেখে হাফিজকে বলে দেওয়ার বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) এ প্রসঙ্গে বলেন: আমি এ বিষয়ে হযরতমসীহ মওউদ (আ.)-এর ফতোয়া দেখি নি। এ বিষয়ে মৌলবী মহম্মদ ইসমাঈল সাহেব মৌলবী ফাজিল বলেন,হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এটিকে বৈধ আখ্যায়িত করেছেন।

তিনি বলেছেন: এটা বৈধ। এর অনেক উপকার হতে পারে। এর ব্যবস্থা হিসেবে এমনটি করা যেতে পারে যে, সমস্ত তারাবিহতে এক ব্যক্তি তিলাওয়াত শোনার জন্য না বসিয়ে রেখে চার ব্যক্তিকে দুই রাকাত করে শোনার জন্য নিযুক্ত করা উচিত। এভাবে তাদেরও ছয় ছয় রাকাত করে নামায হয়ে যাবে।

জানতে চাওয়া হয় যে ফিকাহ কি এটাকে বৈধ আখ্যায়িত করে? তিনি বলেন, আসল উদ্দেশ্য হল মানুষকে কুরআন শরীফ শুনতে অভ্যস্ত করে তোলা আর হযরত মসীহ মউওদ (আ.)-এর এই ফতোয় প্রয়োজন এবং বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন- কেউ যদি দাঁড়িয়ে নামায না পড়তে পারে তবে বসে নামায পড়বে আর বসে না পারলে শুয়ে শুয়ে নামায পড়বে। কিম্বা কাপড়ে নোংরা লেগে থাকে তা ধোওয়া সম্ভব না হয় তবে সেভাবেই নামায পড়া উচিত, এতে কোন সমস্যা নেই। বরং এটাই প্রয়োজন।

(আল ফজল পত্রিকা, নম্বর-৬৬, ১৭তম খণ্ড,২১ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০)

হুযুর আনোয়ার (আই.) ১০ই জুন ২০২২ তারিখের চিঠিতে এ সম্পর্কে লেখেন: সাধারণ নিয়মে নামাযের সময় ইমাম যদি ভুলে যায় কিম্বা কুরআন করীমে তিলাওয়াত ভুলে যায়, তবে কোন মুকতাদিকে, যদি তার মনে থাকে, কুরআন করীমের সেই অংশ লুকমা দিতে পারে কিম্বা সংশোধন করতে পারে।কিন্তু কুরআন করীম দেখে দেখে কোন মুকতাদির লুকমা দেওয়া বৈধ নয়। যেমন হযরত মুফতি মহম্মদসাদিক সাহেব তাঁর রচনা ‘যিকরে হাবিব’ পুস্তকে বর্ণনা করেন: ডক্টর মির্যা ইয়াকুব বেগ সাহেব একবার হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর সমীপে নিবেদন করেন যে,কুরআন শরীফ এর দীর্ঘ সূরাগুলি মুখস্ত হয় না অথচ সেগুলি নামাযে পড়ার বাসনা আছে। কুরআন শরীফ খুলে সামনে কোন রেহেল বা টেবিলের উপর বা হাতের উপর রেখে পড়ার পর পাশে রেখে যদি রুকু ও সিজদা করি এবং দ্বিতীয় রাকাতে পুনরায় হাতে নিই- তবে এমনটা কি করা যায়? হযরত সাহেব বলেন- এর কি প্রয়োজন? আপনি কয়েকটি সুরা মুখস্ত করে নিন আর সেগুলিই পড়ুন। ”

(যিকরে হাবিব, পৃ: ১৩৬)

অতএব যতটা কুরআন মুখস্ত থাকে সেটাই নামাযে পড়া উচিত আর এর পাশাপাশি কুরআন করীমের আরও কিছু অংশ মুখস্ত করার চেষ্টা করুন। কেননা, কুরআন করীম মুখস্ত করা এবং পাঠ করাও পুণ্যের কাজ।

এই কারণেই হযরত খলীফাতুল মসীহ সালিস (রাহে.) এর খিলাফতকালে ১৭ই জুন ১৯৭১ সালের মজলিসে ইফতায় এই বিষয়টি উপস্থাপিত হলে হুযুর (রাহে.) এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে বলেন- ‘নফল নামাযের ক্ষেত্রেও কুরআন মজীদ দেখে পড়া পছন্দনীয় বিষয় নয়। তাছাড়া এর অনুমতি দিলে কুরআন মুখস্ত করার প্রতি মানুষ উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যও ব্যহত হয়। অতএব এই পদ্ধতি অবলম্বন করা অপছন্দনীয় বিষয়।”

(রেজিস্টার ফয়সলাজাত মজলিসে ইফতা, পৃ: ৪৯, অপ্রকাশিত)

হাদীস ও ফিকা গ্রন্থে কতিপয় এমন আভাস পাওয়া যায় যা থেকে জানা যায় যে কতিপয় সাহাবা, যেমন হযরত উসমান, হযরত আনাস এবং হযরত আশেয়া প্রমুখ নফল নামায পড়ার সময় কোন ব্যক্তিকে কুরআন হাতে দিয়ে পাশে বসিয়ে রাখতেন যারা ভুলে গেলে কুরআনের আয়াত ধরিয়ে (লুকমা) দিতেন কিম্বা তারা এমন কোন ব্যক্তির পেছনে নামায পড়তেন যারা দেখে কুরআন দেখে তাদেরকে ইমামত করাতেন। (কাশফুল গাম্মা) (সহীহ বুখারী, কিতাবুল আযান)

চার ফিকাহবিদগণের মধ্য থেকে ইমাম আবু হানিফার মতে নামায কুরআন করীম দেখে পড়লে নামায ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ইমাম শাফি এবং ইমাম আহমদ এর মতানুসারে এতে নামায ত্রুটিপূর্ণ হয় না। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদের অন্য একটি উক্তি অনুসারে নফল নামাযে এমনটি করা বৈধ, কিন্তু ফরজ নামাযে বৈধ নয়।

(কিতাবুল মিযান, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৭)

এই সব ‘আসর’ (সাহাবা কিম্বা তাবেঈনদের পক্ষ থেকে যে সমস্ত বর্ণনা আমাদের কাছে পৌঁছেছে) আমর ও ফিকাহবিদগণের মতামত বিশ্লেষণ করে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) বলেন:

‘নামাযের সময় কুরআন তিলাওয়াতকারী দেখে পড়া বা শ্রবণকারীর দেখে লুকমা দেওয়ার বিষয়ে আমার মতে ইমাম আবু হানিফার মতবাদই সঠিক। (অর্থাৎ এমনটি করলে নামায ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায়) এখানে উদাহরণ হিসেবে যেমন বলা হয়েছে যে, হযরত আয়েশাকে ক্রীতদাস জাকু তাকে কুরআন করীম পাঠ করে ইমামত করাতেন- এটা কোন হাদীস নয়। বরং‘আসর’। আর সেগুলি এমন ‘আসর’ নয় যা হযরত রসুলুল্লাহ্‌ (সা.) দ্বারা অনুমোদিত হওয়া প্রমাণিত হয়। এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে ‘আসর’ এর সেই মর্যাদা নেই যা হাদীসের রয়েছে।

(মজলিসে ইফতা-র সেক্রেটারীর নামে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)এর লেখা পত্র), ১১ই মে, ১৯৯৩)

অনুরূপভাবে ফিকা আহমদীয়ায় বর্ণিত এই বিষয়ের সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) প্রাইভেট সেক্রেটারী সাহেবকে নির্দেশ দিয়ে বলেন-

‘ফিকাহ আহমদীয়ার এই পৃষ্ঠাটি রাবোয়া পাঠিয়ে দিন। এই রেওয়াতগুলি কিভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠল? এগুলি তো অপছন্দনীয় বিষয়। সেযুগে তো কুরআন সেইরূপে বিদ্যমানই ছিল না যেমনটি বর্তমান যুগে আমাদের সামনে আছে। সেই সময় পাথর, চামড়া, গাছের পাতা ও বাকলে কুরআন লেখা হত। ভুল ধরিয়ে দেওয়া বা লুকমা দেওয়ার জন্য কি সেই সব পাথরগুরি মসজিদে রাখা হত? এগুলি এমন কথা যা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আমাদের ফিকাহ-য় যে সব অনর্থক বিষয়াদির অনুপ্রবেশ ঘটেছে, নতুন করে সেগুলির পর্যালোচনা করা জরুরী হয়ে পড়েছে।

(দারুল ইফতার নামে প্রাইভেট সেক্রেটারীর পক্ষ থেকে করা ফ্যাক্স, ৬ই জানুয়ারী,১৯৯৮)

এই বিষয়কে আরও দিক-নির্দেশনা প্রদান করতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) বলেন: নামাযের মাঝে কুরআন করীম পড়ে স্মরণ করানোর কোন বৈধতা নেই। আঁ হযরত (সা.)-এর যুগেও এমনটি হয় নি আর পরবর্তীতে খলীফায়ে রাশেদীনের যুগেও হয়নি। যদি কোন ক্বারী ভুল করত তবে সেক্ষেত্রে মুকতাদীদের মধ্য থেকে কারোর মনে মুখস্ত থাকলে সংশোধন করিয়ে দিত, অন্যথায় খোদার নিকট এটি ক্ষমাযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

(মকতুব হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে, দারুল ইফতা রাবোয়ার নামে)

অতএব এ সম্পর্কে আমারও অবস্থান এটাই যে, কুরআন করীম যতটুকু মুখস্ত আছে সেটাই নামাযে পড়া উচিত এবং আরও বেশি কুরআন মুখস্ত করার চেষ্টা করা উচিত।

কিন্তু যদি কারো এমন বাধ্যবাধকতা থাকে যার কারণে কুরআন করীমের কোনও অংশ তার মুখস্ত না থাকে আর এমন একান্ত বাধ্যবাধতা সবক্ষেত্রে অবশ্য থাকে না। এমন নিরুপায় অবস্থা হলে সাময়িকভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সম্পর্কে বর্ণিত রেওয়াত থেকে উপকৃত হতে পারে। কিন্তু যেমনটি হযরত মুসলেহ

(এরপর ৯ পাতার পর.....)

জুমআর খুতবা

সেই সত্ত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! যদি তারা মদিনায় আক্রমণ করে তাহলে তাদের জন্য এমন সব পাথর চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে যার বৃষ্টিতে তাদের সেভাবেই বিনাশ করা হবে যেমনটি বর্তমানের বিপরীতে অতীত কাল হয়ে থাকে। (হাদীস)

আমাদের যত লোক আজ শহীদ হয়েছেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে জান্নাতে একত্রে রেখেছেন এবং সবাই আল্লাহ্ তা'লার কাছে প্রার্থনা করেছেন, হে খোদা! আমাদের পেছনে রয়ে যাওয়া পরিবারবর্গের দেখাশুনা করো। (হাদীস)

হামরাউল আসাদ যুদ্ধ প্রসঙ্গে আঁ হযরত (সা.)-এর পবিত্র জীবনীর ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী।

মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমশ অবনতির দিকে যাওয়া পরিস্থিতি দৃষ্টে দোয়ার আহ্বান।

আল্লাহ্ তা'লা বিশ্ব নেতাদের বিবেক দিন যারা বিশ্বযুদ্ধকে উস্কে দেওয়ার আরো চেষ্টা করছে আর মুসলিম উম্মাহকেও বিবেক-বুদ্ধি ও সামর্থ্য দিন, তারা যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজ প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে যথাযথ মোকাবেলা করতে পারে এবং বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে পারে।

মৃতদের স্মৃতিচারণ ও জানাযা গায়েব-

মৌলানা গোলাম আহমদ নাসীম সাহেব মুরুব্বী সিলসিলা, সাবেক প্রফেসর জামেয়া আহমদীয়া রাবোয়া এবং ডক্টর আহসানুল্লাহ্ যাফর সাহেব, সাহেব আমীর জামাত আহমদীয়া, যুক্তরাষ্ট্র।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৯ এপ্রিল, , ২০২৪, এর জুমুআর খুতবা (১৯ শাহাদত, ১৪০৩ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহহুদ, তাআ'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, উহুদের যুদ্ধের প্রে ক্ষাপটে আরও কিছু ঘটনা বর্ণনা করছি যার মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের অনিন্দ্যসুন্দর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সমধিক জ্ঞান লাভ হয়।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তিনি ঋণগ্রস্ত ছিলেন। আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে এমর্মে সাহায্য প্রার্থনা করি যে, আপনি ঋণদাতাদের বুঝান যেন তারা তার ঋণের পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে দেয়। মহানবী (সা.) তাদের কাছে এ ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, কিন্তু ঋণদাতারা কোনো ছাড় দেয়নি। তখন মহানবী (সা.) আমাকে বলেন, যাও এবং তোমার প্রত্যেক জাতের খেজুর পৃথক পৃথক করে রাখো। বিভিন্ন জাতের খেজুর ছিল সেগুলোকে পৃথক পৃথক ভাবে স্তুপীকৃত করে । তিনি (সা.)বলেন, আজওয়া জাতের খেজুরকে পৃথক রাখবে এবং ইযকো বিনযায়েদ জাতের খেজুরকে আলাদা রাখবে; এরপর আমাকে সংবাদ পাঠাবে। আমি সেভাবেই করি এবং মহানবী (সা.)-কে আসার জন্য অনুরোধ করি। তিনি (সা.) আসেন এবং খেজুরের স্তু পের ওপর অথবা এর মাঝে বসে পড়েন। অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, তাদেরকে এগুলো মেপে মেপে দাও। এরপর আমি সেগুলো মেপে দিই, এমনকি তাদের প্রাপ্য তাদেরকে পূর্ণরূপে বুঝিয়ে দেওয়ার পরও আমার খেজুর বেঁচে যায়। এমন মনে হচ্ছিল যেন তা একটুও কমেনি। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল বুইয়ু, হাদীস-২১২৭)

মহানবী (সা.) উহুদের (যুদ্ধের) শহীদদের জন্য দোয়া করেন, "হে আল্লাহ্! উহুদের (যুদ্ধের) শহীদদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের জন্য উত্তম তত্ত্বাবধায়ক সৃষ্টি করো।" এর বিস্তারিত উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, হযরত মুআয (রা.)'র বৃদ্ধা এবং ক্ষীণদৃষ্টির অধিকারিনী মায়ে'র উল্লেখ করেন যা পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে। যিনি মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার টানে মদীনা থেকে বাইরে বের হয়ে এসেছিলেন। যেমনটি আমি বলেছি, বিগত খুতবায় পূর্বেই এর বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করার পর তিনি (রা.) বলেন, 'মহানবী (সা.) তাঁর বাহন থামিয়ে যখন বৃদ্ধা মহিলাকে দেখেন তখন বৃদ্ধার প্রতি তার পুত্রের শাহাদতের জন্য সমবেদনা জানান।' তিনি (রা.) বলেন, 'দেখো! এসব ঘটনা সম্পর্কে ভাব আর দেখো, যে-ই কষ্ট পেতো তিনি (সা.) তার প্র তি সহানুভূতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কত বেশি সংবেদনশীল ছিলেন! এরপর তিনি সেই বৃদ্ধাকে বলেন, তুমিও আনন্দিত হও এবং অন্য সকল বোনকেও- যাদের আত্মীয়স্বজন যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন (তাদেরকে) এই সুসংবাদ শুনিয়ে দাও যে, আমাদের যত লোক আজ শহীদ হয়েছেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে জান্নাতে একত্রে রেখেছেন এবং সবাই আল্লাহ্ তা'লার কাছে প্রার্থনা করেছেন, হে খোদা! আমাদের পেছনে রয়ে যাওয়া পরিবারবর্গের দেখাশুনা করো।

একথা বলার পর তিনি (সা.) নিজেও দোয়া করেন, 'হে খোদা! উহুদের শহীদদের শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর জন্য উত্তম তত্ত্বাবধায়ক সৃষ্টি করো'। এথেকে বুঝা যায় যে কতটা দায়িত্বশীলতার সাথে তিনি (সা.) মদীনায় প্রবেশের পূর্বেই উহুদের শহীদদের রেখে যাওয়া পরিবার-পরিজনদের পরিবারের মনস্তুষ্টির খেয়াল রাখে এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন। যদিও তিনি নিজে আহত ক্ষতবিক্ষত ছিলেন, তাঁর সবচেয়ে প্রিয় আপনজন শাহাদত বরণ করেছেন এবং তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সাহাবীরা মৃত্যুবরণ করেছে তাসত্ত্বেও তিনি প্রতিটি পদক্ষেপে মদীনার লোকজনের মনস্তুষ্টি করছিলেন। তাঁর নিজের কষ্টের প্রতি তিনি ছিলেন সম্পুর্ণভাবে ভ্রুক্ষেপহীন। এত কষ্ট, এত দুঃখ আর এত বিপদের সময়ও অন্যদের প্রতি এমন সহানুভূতি তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি প্রদর্শন করতে পারে না । এমন সময় তো মানুষ কারও প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা তো দূরের কথা, কারো সাথে কথা বলাও পছন্দ করে না। (আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৯, পৃ: ৫৭-৫৮)

এরপর মহানবী (সা.)-এর আরেকটি দোয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়, যা তিনি (সা.)-এক শহীদের বিধবার জন্য করেছেন। সে দোয়াটি ছিল, "আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করছি, খোদা তা'লা তোমার (শহীদ) স্বামীর চাইতে উত্তম তত্ত্বধায়ক কোন ব্যক্তি (তোমার জন্য) সৃষ্টি করুন।" এর বিশদ বিবরণ দিতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, 'উহুদের যুদ্ধ মহানবী (সা.)-এর জন্য ধৈর্যের এক মহা পরীক্ষা ছিল। এর পূর্বে কখনো তাঁর (সা.) ওপর প্রাণঘাতী আক্রমণ হয় নি। উহুদের যুদ্ধে তাঁর (সা.) ওপর কেবল আক্রমণই হয়নি আর কেবল তাঁর কয়েকটি দাঁতই ভেঙ্গে বা কেবল এটি নয় যে তিনি (সা.) আহত হয়েছিলেন বরং শত্রুরা তাঁর সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁর ওপর দিয়ে, এবং তাঁর সঙ্গীদের ওপর দিয়ে, তাঁদের দেহগুলোকে পদদলিত করে চলে যায়। তাঁর জীবনে এরূপ ঘটনা এটাই প্রথমবার ঘটেছিলো। কিন্তু এ যুদ্ধেও আমরা দেখে যে মহানবী (সা.) অসাধারণ সৎসাহস ও নিজের সর্বোত্তম নৈতিকতার আদর্শ উপস্থাপন করেছেন এবং মানুষের প্রতি সহানুভূতি ব্যক্ত করেন এবং তাদের মনস্তুষ্টি করেন। এই যুদ্ধের বৃত্যান্ত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি (সা.) নৈতিক চরিত্রের কীরূপ মহান মানে উপনীত ছিলেন। এই যুদ্ধে সাহাবীদের বিরল ত্যাগের কথাও জানা যায়।' তিনি (রা.) বলেন, 'আমি সে সময়ের কথা বলছি, যখন যুদ্ধ শেষে তিনি (সা.) মদীনায় ফেরত আসছিলেন। মদীনার মহিলারা, যারা তাঁর শাহাদতের সংবাদ শুনে চরম উৎকণ্ঠিত ছিলো। এ পর্যায়ে তারা মহানবী (সা.)-এর আগমনের সংবাদ পেয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য মদীনার উপকণ্ঠে কিছু দূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে তাঁর একজন শ্যালিকা যয়নাব বিনতে জাহাশও ছিলেন। তার তিনজন খুবই নিকটাত্মীয় যুদ্ধে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন।"

{হুযূর (আই.) বলেন,} এখানে আমি স্পষ্ট করে দিচ্ছি, "আনওয়ারুল উলূমে" এ যে ঘটনাটি লেখা আছে বা লিপিকার লিখেছে অথবা তিনি (রা.) এভাবেই নামটি বর্ণনা করে থাকবেন, এতে কিছু ভুল আছে। হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ (রা.), মহানবী সো.)-এর পবিত্র সহধর্মিনী ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর শ্যালিকা অর্থাৎ স্ত্রীর বোনের নাম ছিল হযরত হুমনা বিনতে জাহাশ। যিনি হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)'র স্ত্রী ছিলেন। যাহোক, যে যে স্থানে নামের ভুল আছে তা আমি সংশোধন করতে থাকবো।

"মহানবী (সা.) তাকে দেখে বলেন, 'মৃত আপনজনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করো'। (এটি আরবী ভাষার একটি প্রবাদ, যার অর্থ হলো, আমি তোমাকে তোমার আপনজনের মৃত্যু সংবাদ দিচ্ছি।) তখন হামনা, যার আসল নাম ছিল হামনা বিনতে জাহাশ, তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি কোন্ মৃতের জন্য দুঃখ করবো? তিনি (সা.) বলেন, তোমার মামা হামযা শহীদ হয়েছেন। এ কথা শুনে হযরত যয়নাব বা হামনা, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْن পাঠ করেন এবং বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তিনি কতই না উত্তম মৃত্যুবরণ করেছেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, তুমি তোমার আরেক আপনজনের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করো। হামনা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! কার জন্য? তিনি (সা.) বলেন, তোমার ভাই আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশও শহীদ হয়েছেন। হামনা (রা.) পুনরায় اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْن পাঠ করেন আর বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্; তার যে বড় প্রশংসনীয় মৃত্যু হয়েছে। পুনরায় তিনি (সা.) বলেন, হামনা! তুমি তোমার আরও এক মৃতের জন্য দুঃখ প্রকাশ করো।তিনি জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! কার জন্য? মহানবী (সা.) বলেন, তোমার স্বামীও শহীদ হয়ে গিয়েছেন। একথা শুনে হামনা (রা.)'র চোখ থেকে অশ্রু ধারা বইতে আরম্ভ করে আর তিনি বলেন, হায় পরিতাপ! এটি দেখে মহানবী (সা.) বলেন, দেখো! এক নারীর তার স্বামীর সাথে কতটা গভীর সম্পর্ক হয়ে থাকে। যখন আমি যয়নবকে তার মামার শহীদ হওয়ার সংবাদ প্রদান করি তখন সে اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْن পড়েছে। যখন আমি তাকে তার ভাইয়ের শহীদ হওয়ার সংবাদ দিই তখনও সে اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْن পড়েছে। কিন্তু যখন আমি তার স্বামীর শহীদ হওয়ার সংবাদ দিই তখন সে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, হায় পরিতাপ! আর (তখন) সে তার অশ্রু সংবরণ করতে পারেনি এবং বিচলিত হয়ে পড়ে। অতঃপর তিনি বলেন, এক নারী এমন সময়ে নিজের সবচেয়ে প্রিয় আত্মীয়স্বজন আর রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়দেরও ভুলে যায়, কিন্তু ভালোবাসা প্রদানকারী স্বামীর কথা তার মনে থাকে। এরপর তিনি হামনাকে জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি তোমার স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ শুনে হায় পরিতাপ কেন বলেছিলে? তখন হামনা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার তার সন্তানদের কথা মনে পড়ে যায় যে, (এখন) তাদের দেখাশোনা কে করবে?

তিনি (সা.) বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করছি যেন তিনি তাদের জন্য তোমার স্বামীর চেয়ে উত্তম তত্ত্বধায়ক কোনো ব্যক্তি দাঁড় করার।

অতএব এই দোয়ার ফলাফল এই ছিল যে, হামনার বিবাহ হযরত তালহার সাথে হয় আর তাদের ঘরে মুহাম্মদ বিন তালহার জন্ম হয়। কিন্তু ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত তালহা নিজের পুত্র মুহাম্মদের প্রতি ততটা ভালোবাসা ও স্নেহ প্রদর্শন করতেন না যতটা হামনার পূর্বের সন্তানদের প্রতি করতেন। মানুষ বলতো তালহার চেয়ে মহান আর কেউ নেই যে অন্য কারো সন্তানদের এতটা স্নেহ ও ভালবাসার সাথে লালনপালন করে। আর এটি মহানবী (সা.)-এর দোয়ারই পরিণাম ছিল।"

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৯, পৃ: ৫৫-৫৭) (উসদুল গাবা, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৭১)

অতঃপর তিনি একই ঘটনা এভাবেও উল্লেখ করেছেন যে, তিনি (সা.) যখন হামনা বিনতে জাহাশের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন আর বলেন যে, দেখো এক নারীর তার স্নেহশীল স্বামীর সাথে ভালবাসার কত গভীর সম্পর্ক থাকে! এর মাধ্যমে তিনি একথা বোঝাতে চেয়েছেন, পুরুষদের উচিত নারীদের সাথে সদাচরণ করা। এটি পুরুষদের জন্য (একটি) সাধারণ শিক্ষা যে, তারা যেন নারীদের সাথে সদাচরণ করে আর ছোট ছোট বিষয়াদিতে তাদেরকে মারধোর করা আরম্ভ না করে। তারা খোঁড়া অজুহাত দেখায় যে, আমাদের প্রহার করার অনুমতি রয়েছে। আজকালও এমনটি হয়ে থাকে। বরং সদাচরণ করা উচিত। তিনি বলেন, যেখানে তাদের নারীরা নিজ পরিবার-পরিজন থেকে পৃথক হয়ে তাদের কাছে থাকে সেখানে ন্যায়বিচারের দাবি হলো তাদের সম্মান করা, কথায় কথায় তাদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করা উচিত নয়। তাঁর (সা.)একথা বলায় একদিকে তো হামনা বিনতে জাহাশের মনজয় হয়েছে আর অপরদিকে তিনি নারীদের সাথে সদাচরণেরও নসীহত করেন। এভাবে প্রতিটি কথায় একটি শিক্ষনীয় দিক থেকে থাকে। মানুষ যদি মনোযোগের সাথে শ্রবণ করে আর চিন্তা করে তাহলে এটি বোঝা যায় যে, মহানবী (সা.)-এর কথা কেবল সেই ব্যক্তির জন্য ছিল না, বরং এটি সামগ্রিকভাবে সবার জন্য এক উপদেশ।

অতঃপর মহানবী (সা.)-এর জীবন চরিতের একটি দিক হলো তিনি অন্যদের আবেগ অনুভূতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

সে সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, যখন তিনি মদিনায় প্রবেশ করেন তখন যেহেতু আহত হওয়ার কারণে তিনি অত্যধিক দুর্বল ছিলেন, তাই সাহাবীরা সাহায্য করে তাঁকে বাহন থেকে নামান। তখন মাগরিবের নামাযের সময় ছিল। তিনি (সা.) নামায পড়েন আর ঘরে চলে যান। মদিনার সেসব নারী,যাদের পরিবার পরিজন যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল, তাদের কাছে তাদের সংবাদ পৌঁছে গিয়েছিল। তারা ক্রন্দন আরম্ভ করে দেয়। মহানবী (সা.) যখন নারীদের এই ক্রন্দনের আওয়াজ শুনেন তখন তাঁর মুসলমানদের কষ্টের কথা স্মরণ করে তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠে। অতঃপর তিনি বলেন, 'লাকীন হামযাতা ফালা বাওয়াকেয়া লাহু।' অর্থাৎ আমাদের চাচা এবং দুধভাই হামযাও শহীদ হয়েছেন, কিন্তু তার জন্য বিলাপ করার (কি) কেউ নেই? একথা শুনে সাহাবীরা, যাদের মাঝে তাঁর (সা.) আবেগ-অনুভূতিকে পূর্ণ করার ব্যাকুলতা থাকতো, তারা চাইতেন তাঁর (সা.) কোনো তুচ্ছাতিতুচ্ছ আবেগ বা তুচ্ছাতিতুচ্ছ অনুভূতিও যেন এমন না রয়ে যায় যা অপূর্ণ রয়ে যাবে। তারা নিজেদের গৃহ পানে ছুটে যান আর নিজ স্ত্রীদের গিয়ে বলেন যে, অনেক হয়েছে, এখন তোমরা তোমাদের আত্মীয়স্বজনের জন্য ক্রন্দন বন্ধ করো আর মহানবী (সা.)-এর ঘরে গিয়ে হামযার জন্য মাতম করো। এরই মাঝে মহানবী (সা.) যেহেতু ক্লান্ত শ্রান্ত ছিলেন তাই তিনি বিশ্রাম নিতে যান। হযরত বেলাল এশার আযান দেন, কিন্তু তিনি (সা.) ক্লান্ত হয়ে এসেছেন- এই ধারণা করে তিনি তাঁকে জাগাননি। অর্থাৎ তিনি (সা.) তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ সময় কেটে যায় তখন তিনি তাঁকে (সা.) নামাযের জন্য জাগান। তিনি (সা.) যখন জাগেন নারীরা তখন পর্যন্ত তাঁর (সা.) ঘরে হযরত হামযার জন্য বিলাপ করছিল। তিনি (সা.) বলেন, এটি কী হচ্ছে? নিবেদন করা হয় যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! মদিনার নারীরা হযরত হামযার মৃত্যুতে কাঁদছে। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা মদিনার নারীদের প্রতি কৃপা করুন। তারা আমার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেছে। অতঃপর তিনি বলেন, আমি পূর্বেই জানতাম যে, আনসাররা আমার প্রতি অনেক বেশি ভালোবাসা রাখে। একইসাথে তিনি বলেন, এভাবে মাতম করা আল্লাহ্ তা'লার কাছে অপছন্দনীয় বিষয়। সাহাবীরা নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)!এটি আমাদের জাতিগত অভ্যাস । আর আমরা যদি এভাবে ক্রন্দন না করি তাহলে আমাদের আবেগ প্রশমিত হতে পারে না। তিনি (সা.) বলেন, আমি কাঁদতে বারণ করছি না, কিন্তু নারীদের বলে দেওয়া হোক যে, তারা যেন নিজেদের মুখ না চাপড়ায় আর নিজেদের চুল যেন না ছিড়ে। বিলাপ করার সময় তারা নিজেদেরই প্রহার করত। অর্থাৎ নিজেদের চুল যেন না ছিড়ে আর মুখ যেন না চাপড়ায় আর নিজেদের কাপড় যেন না ছিড়ে। আর যদি এমনিতেই আবেগের বশে কান্না আসে, অর্থাৎ প্রাকৃতিকভাবেই আবেগে কান্না চলে আসে, তাহলে কাঁদতে পারে। এসব কথার মাধ্যমে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্টের চিত্র ফুটে ওঠে, আহত ও কষ্টে থাকা সত্ত্বেও তাঁর (সা.) অন্যদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি কতটা সম্মান ছিল!"

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৯, পৃ: ৫৮-৫৯)

অতঃপর তিনি এই ঘটনাটিকে এই আঙ্গিকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন মহানবী (সা.) দেখেন যে, মদিনার নারীরা নিজেদের মৃতদের জন্য বিলাপ ও মাতম করছে তখন তিনি এই ধারণায় যে, মুহাজের ও হযরত হামজার আত্মীয়রা যেন এই ধারণা না করে যে, এখানে আমাদের কেউ নেই। তাদের আবেগের প্রতি লক্ষ্য করে তিনি (সা.) বলেন, আজ (কি) হামজার জন্য ক্রন্দনের কেউ নেই? আর এরপর যখন মদিনার নারীরা হযরত হামজার জন্য মাতম করা আরম্ভ করে তখন তিনি নিষেধ করে দেন যে, এভাবে মাতম করা বৈধ নয়। এ থেকে জানা যায় যে, যদি আসলেই তিনি চাইতেন যে, হযরত হামযার জন্য মাতম করা হোক তাহলে পরে তিনি নিষেধ করতেন না। তিনি (সা.) যখন হযরত হামজার মৃত্যুতে কারো না কাঁদার কারণে আফসোস করেন তখনও তাঁর উদ্দেশ্য কেবল মনোস্তুষ্টি ছিল। আর যখন তিনি ক্রন্দনকারীদের নিষেধ করেন তখনও তাঁর লক্ষ্য মনোস্তুষ্টিই ছিল, কেননা তিনি সেই নারীদের ক্রন্দন করতে নিষেধও করেন আর একইসাথে এটিও বলেন যে, তারা আমার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেছে। আর এটিও বলেন যে, আমি তো পূর্বেই জানতাম যে, আনসাররা আমার প্রতি অধিক সহানুভূতি রাখে। আর তাঁর একথা বলার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তারা যেন ক্রন্দন করতে বারণ করায় মনে কষ্ট না পায়। তিনি (সা.) নিষেধও করেন আর তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন। আমাদের দৃষ্টিতে এটি কতই না অসাধারণ ও মহান পন্থা যা এমন স্পর্শকাতর সময়ে তিনি অবলম্বন করেছেন। অথচ যখন কিনা প্রিয়জন ও কাছের আত্মীয়-পরিজনরা নিহত হয়ে থাকে, এক ব্যক্তি নিজেও আহত হয়, আর নিকট ভবিষ্যতে বিপদের আশঙ্কাও বিরাজমান থাকে, এমন সময়ে কোনো ব্যক্তি সেরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে না যেমনটি তিনি (সা.) করেছেন।"

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৯, পৃ: ৬০-৬১)

যাদের তরবারি উহুদের যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে, ইতিহাসের পুস্তকসমূহে সেসব সাহাবীদের উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায়, যখন মহানবী (সা.) গৃহে প্রবেশ করেন তখন নিজ কন্যা ফাতেমাকে (রা.) তরবারি দিয়ে বলেন, ***'আগসিলি আন হাযা দামআহু'*** হে আমার প্রিয় কন্যা! এই তরবারিতে লেগে থাকা রক্ত ধুয়ে দাও। আল্লাহর কসম! আজকে এই তরবারি যথার্থ বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছে। এরপর হযরত আলী (রা.) ও নিজের তরবারি হযরত ফাতেমাকে (রা.) দিয়ে বলেন, এই তরবারিতে লেগে থাকা রক্ত ধুয়ে দাও, এই সময়ে তার মুখেও রসূলুল্লাহ (সা.) যে বাক্যগুলো বলেছিলেন তেমনই বাক্য ছিল; আল্লাহর কসম! আজকে এই তরবারি অসাধারণ কাজে দিয়েছে। এটি শুনে রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন..

لَئِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ الْيَوْمَ الْقِتَالَ لَقَدْ صَدَقَ مَعَكَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَ اَبُو دُجَانَةَ

যদি আজকে তুমি যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করে থাক তাহলে তোমার সাথে সাহল বিন হুনায়েফ এবং আবু দুজানাও অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেছে। একটি রেওয়াতে এসেছে রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যদি তুমি তরবারি পরিচালনায় নৈপুন্য দেখিয়ে থাক তাহলে সাহল বিন হুনায়েফ, আবু দুজানা, আসেম বিন সাবেত এবং হারেস বিন সাম্মাও (রা.) অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেছে।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৭ম খণ্ড, পৃ: ৬২]

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে হযরত আলী (রা.) উহুদ থেকে ফেরত এসে হযরত ফাতেমা (রা.) কে নিজের তরবারি দিয়ে বললেন, এটিকে ধুয়ে দাও আজকে এই তরবারি অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছে। রসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আলীর (রা.) এই কথা শুনছিলেন, তিনি (সা.) বললেন, আলী! কেবল তোমার তরবারিই নৈপুণ্য প্রদর্শন করে নি আরো তোমার ভাইয়েরা রয়েছে যাদের তরবারিসমূহও নৈপুণ্য দেখিয়েছে। তিনি (সা.) ছয়-সাত জন সাহাবীর নাম নিয়ে বললেন, এদের তরবারি তোমার তরবারি থেকে কম ছিল না। মোটকথা তিনি (সা.) এটি সহ্য করতে পারেন নি যে তাঁর জামাতা কোন এমন কথা বলবে যার দ্বারা অন্য সাহাবীদের মনে আঘাত লাগতে পারে। এর দ্বারা বোঝা যায় ছোট ছোট বিষয়ের ওপরও তাঁর চোখ থাকতো। আর যদিও উহুদের যুদ্ধের ঘটনা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের দিক থেকে এতই বড়ো ঘটনা ছিল যে, এই ঘটনার পর লোকদের অনেক দুশ্চিন্তা ছিল যে এখন শত্রুরা ধৃষ্ট হয়ে ওঠবে অথবা ভবিষ্যতে কী হবে তা বলা যায় না? মানুষ এমন সময়ে ছোট ছোট বিষয়গুলোর দিকে মনোযোগ দেয় না, কিন্তু তিনি (সা.) সবার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন এবং সবার মনস্তুষ্টি করেন। "

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৯, পৃ: ৫৯-৬০)

উহুদের যুদ্ধের ঘটনাবলী এখানেই শেষ হচ্ছে। আরেকটি যুদ্ধাভিযানের কথা উল্লেখ করছি। এর নাম 'হামরাউল আসাদ' যা তৃতীয় হিজরী সনের শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে উহুদের যুদ্ধের পরিশিষ্ট। এই যুদ্ধের ফলাফলের ভিত্তিতে উহুদের যুদ্ধকে সত্যিকার অর্থে মুসলমানদের বিজয় বলে গণ্য করা হয়।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) ৭ম খণ্ড, পৃ: ১১৯]

হামরাউল আসাদ মদীনা থেকে যুল হুলায়ফা যাওয়ার সময় পথের বাম দিকে মদীনা থেকে আট মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থান।

(ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ১০৬) (মুজামুল বালদান, (উর্দু) ডক্টর গোলাম জিলানী বারক, পৃ: ১২৩))

হামরাউল আসাদের গাযওয়ার কারণ কী- এই বিষয়ে লেখা আছে, উহুদের যুদ্ধের পর রসূলুল্লাহ (সা.) সন্ধ্যার সময় মদীনায় ফেরত আসলেন এবং গুরুতর আহত হওয়া সত্ত্বেও মাগরিবের নামায সাহাবীদের সহায়তায় হেঁটে মসজিদে এসে আদায় করলেন। একইভাবে এশার নামাযও মসজিদে এসে আদায় করলেন। এশার নামাযে পর মহানবী (সা.) নিজ গৃহে ফেরত গেলেন কিন্তু বোঝা যায় তিনি (সা.) সারা রাত জাগ্রত অবস্থাতেই কাটিয়েছেন। কেননা তার আশঙ্কা ছিল যে আবু সুফিয়ান নিজ সেনাবাহিনী নিয়ে মদীনায় আক্রমণের পরিকল্পনা করতে পারে। এই কারণেই মদীনায় এক প্রকার হাঙ্গামী পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল এবং মহানবী (সা.) এর গৃহের বাইরেও রীতিমতো পাহারার ব্যবস্থা ছিল।তিনি (সা.) আবু সুফিয়ানের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও খোজ খবর নিয়েছেন যে, সে কি মদিনায় আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে? যদিও প্রাথমিক রিপোর্ট দিল যে, আবু সুফিয়ান তার বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে মক্কার দিকে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু তবুও তিনি (সা.) এই খবরে উদাসীন হন নি। অবশেষে তার (সা.) আশংকাই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আর তখনও রাত শেষ হয়নি এর মাঝেই তিনি (সা.) সংবাদ পেলেন যে, আবু সুফিয়ান নিজ সৈন্যবাহিনী নিয়ে মদিনায় আক্রমণ করতে প্রস্তু তি নিচ্ছে। মূল ঘটনা ছিল- যখন মুশরিকরা উহুদের যুদ্ধের পর ফেরার পথে যাদের সাথেই দেখা হতো তারা যুদ্ধের খবর শুনে এই বলে খোটা দিতো যে, তোমরা মুহাম্মদ (সা.)- কে হত্যা করতে পার নি বা তোমরা মুসলমান নারীদের সাথে নিয়ে আস নি, তাদের কাউকে বন্দী করে আনতে পার নি আর কোনো সম্পদ বা মালে গনিমতও আন নি তাহলে তোমরা কোন বিজয়ের দাবি করছ? এমনসব খোটা শুনতে শুনতে এই সৈন্যবাহিনী মদিনা থেকে এক বর্ণনা মোতাবেক চুয়াত্তর কিলোমিটার আর কিছু বর্ণনা মোতাবেক পঞ্চান্ন কিলোমিটার দূরে রাওয়াহা নামকজায়গায় পৌছে ঘাটি স্থাপন করে। তখন তাদের নিজেদের মাঝে এই বিতর্ক হতে থাকে যে, কথা তো আসলেই সত্য; না আমাদের কাছে কোনো বন্দি আছে না মালে গনিমত আছে। তাই আসলেই এটি অনেক খারাপ হয়েছে। আমাদের ফেরত যাওয়া উচিত এবং মদিনায় আক্রমণ করা উচিত। অবশ্য সেই সৈন্যদলের অন্য এক নেতা সাফওয়ান বিন উমাইয়া বলে কস্মিনকালেও এহেন কাজ করতে যেয়ো না, এখন মদিনায় আক্রমণ করার কথা চিন্তাও করবে না নতুবা অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হবে। কিন্তু আবু সুফিয়ান ও তার অন্যান্য সাথিদের অধিকাংশ মিলে সিদ্ধান্ত নিল যে, আমাদের মদিনায় আক্রমণ করা উচিত নতুবা কোন মুখ নিয়ে মক্কায় ফেরত যাবো। এদিকে আবু সুফিয়ানের সৈন্যবাহিনীতে এই সলাপরামর্শ চলছিল আর ঠিক তখন ফযরের নামাযের জন্য হযরত বিলাল আযান দিচ্ছেন। আর বসে মহানবী (সা.) এর বাহিরে আসার অপেক্ষা করতে থাকেন। এর মাঝেই হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর বিন আউফ বিন মুযনি মহানবী (সা.)-এর সন্ধানে আসেন। যখন তিনি (সা.) বাহিরে আসেন তখন তিনি দাড়িয়ে মহানবী (সা.) কে সংবাদ দিলেন যে তিনিতার ঘর থেকে আসছিলেন। আবু সুফিয়ান বাহিনীর পাশ ঘেঁষে তাকে পথ অতিক্রম করতে হয়। তিনি আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীদের এ কথা বলতে শুনেছেন যে, তোমরা বলার মতো কিছু করোনি। তোমরা তাদের অর্থাৎ মুসলমানদের কোনো ক্ষতি করতে পারো নি পারোনি। কোনো কষ্ট দিতে পারোনি আর তোমরা ধ্বংস না করে তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছো । কাফেররা বলে, মুসলমানদের মাঝে এমন বড়ো বড়ো অনেক লোক রয়েছে যারা তোমাদের মোকাবিলার জন্য একত্রিত হবে। তাই তাদের মাঝে যারা বাকি আছে তাদেরকে সমূলে উৎপাটনের উদ্দেশ্যে ফেরত চলো। সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা এই কাজে তাদের বাধা দিয়ে বলে, হে আমার জাতি! এমনটি করো না কেননা তারা যুদ্ধ করেছে আর আমার ভয় হলো তাদের যেসব মানুষ যুদ্ধে অংশ নেয় নি তারাও এবার তাদের সাথে একত্রিত হয়ে যাবে। তোমরা ফেরত (মক্কা) চলো। কেননা তোমরাই বিজয়ী হয়েছ। আমার ভয় হলো যদি তোমরা পুনরায় ফেরত যাও তাহলে তোমরা শোচনীয় ভাবে পরাজিত হবে।

মহানবী (সা.) এই সকল কথা শুনে বলেন, সাফওয়ান তত বুদ্ধিমান নয় তবে তার এই কথা অর্থাৎ আবু সুফিয়ানকে মদিনায় আক্রমণ করতে বাধা দেওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। কিন্তু একইসাথে মহানবী (সা.) অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে বলেন-

সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! যদি তারা মদিনায় আক্রমণ করে তাহলে তাদের জন্য এমন সব পাথর চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে যার বৃষ্টিতে তাদের সেভাবেই বিনাশ করা হবে যেমনটি বর্তমানের বিপরীতে অতীত কাল হয়ে থাকে। [দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) ৭ম খণ্ড, পৃ: ৬০] (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৬৭-২৬৮)

যাহোক, এর বিস্তারিত আগামীতে বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ। দ্বিতীয়ত,সচরাচর যেভাবে আমি দোয়ার আহ্বান জানিয়ে থাকি আজও বলছি যে দোয়া অব্যাহত রাখুন।

যেমনটি ভাবা হয়েছিল এবং যে আশংকা ছিল (তা-ই হয়েছে), ইজরায়েল সরাসরি ইরানে হামলা করেছে, সবার জানা আছে। এর ফলে অবস্থার আরো অবনতি ঘটবে।

আল্লাহ্ তা'লা বিশ্ব নেতাদের বিবেক দিন যারা বিশ্বযুদ্ধকে উস্কে দেওয়ার আরো চেষ্টা করছে আর মুসলিম উম্মাহকেও বিবেক-বুদ্ধি ও সামর্থ্য দিন, তারা যেন ঐক্যবদ্ধ হয়েনিজ প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে যথাযথ মোকাবেলা করতে পারে এবং বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে পারে।

এখন আমি দু'জন মরহুমের স্মৃতিচারণ করতে চাই যাদের মাঝে প্রথম হলেন, মুকাররম মাওলানা গোলাম আহমদ সাহেব নাসীম। তিনি মুরব্বী সিলসিলাহ ছিলেন। জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়াতে প্র ফেসর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং ইদানিংআমেরিকায় বসবাস করছিলেন। অতিসম্প্রতি তিনি ৯৩ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْن

তাঁর পিতার নাম ছিল সালাহ মোহাম্মদ সাহেব যিনি কুসুফ ও খুসুফের নিদর্শন দেখে মাহদীর অন্বেষণ শুরু করেন (চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের নিদর্শন দেখে তিনি মাহদীর অন্বেষণ শুরু করেন) এবং এতে কয়েক বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায় আর অবশেষে ১৯০১ সালে তাঁর বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ হয়। দূরবর্তী এলাকায় বসবাস করায় কাদিয়ানে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আসতে পারেন নি। মীর সালাহ মুহাম্মদ সাহেব আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ওসিয়্যতকারী ছিলেন এবং আহমদীয়াত গ্রহণ করার কারণে তাঁকে ভয়াবহ বিরোধিতার সম্মূখীন হতে হয়। তারা নিজ গ্রামে একক আহমদী পরিবার ছিলেন। মীর গোলাম আহমদ নাসিম সাহেব ছাত্রজীবনে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে ওয়াকফের আবেদন জানিয়ে পত্র লেখেন এবং তাঁর ওয়াক্ফ মঞ্জুর করা হয়েছে মর্মে জানানো হয় পাশাপাশি হেদায়েত দেওয়া হয় যে, পড়াশুনা অব্যাহত রাখুন। ১৯৪৮ সালে দেশ বিভাগের পর মাদ্রাসা আহমদীয়া, আহমদনগরে পড়াশুনা শুরু করেন। ১৯৫৪ সালে মৌলভী ফাযেল পাশ করেন, অতঃপর জামেয়াতুল মুবাশ্বেরীন থেকে শাহেদ ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৫৭ সালে কর্মক্ষেত্রে ঝাপিয়ে পড়েন(অর্থাৎ পদায়ন হয়)। ১৯৬০ সালে তিনি সিয়েরালিয়ন যান। সেখানে তিনি তবলীগেরপাশাপাশি আহমদীয়া স্কুল, বো'র প্রধান শিক্ষক হিসেবে সেবাদান করতে থাকেন। এরপর পাকিস্তান ফেরত আসলে জামেয়া আহমদীয়া-তে তাঁর পদায়ন হয়। সেখানের লাইব্রেরীতে তিনি ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কোনো শিক্ষক ছুটিতে থাকলে তার ক্লাস নিতেন। ইতিমধ্যে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে আরবীতে এম.এ. পাশ করেন। ১৯৬৬ সালে গিয়ানাতে তাঁরপদায়ন হয়। সেখানে তিনি সোয়া চার বছর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭০ সালে তিনি পুনরায় কেন্দ্রে ফেরত আসেন। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্য ন্ত জামেয়া আহমদীয়াতে শিক্ষক হিসেবে, বিশেষকরে বিদেশী ছাত্রদের পড়ানোর দায়িত্বে নিযুক্ত হন। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৯ সাল মোট চারবছর তিনি আফ্রিকার জেম্বিয়ায় মোবাল্লেগ হিসেবে সেবাদান করেন। এরপর ১৯৮০ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত জামেয়া আহমদীয়ায় ইতিহাস এবং তাসাউফ শাস্ত্রের শিক্ষক হিসেবে সেবাদান করতে থাকেন।

তাঁর সম্পর্কে লেখা হয়েছে যে, তিনি সিয়েরালিওন,গিয়ানা এবংজেম্বিয়াতে ১১বছর পর্যন্ত সেবাদান করেছেন আর প্রবাসের এই পুরোটা সময় পরিবার ছাড়া ছিলেন। তাঁর সহধর্মিনী ও তাঁর কুরবানীর কথা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)ও এক বক্তৃতায় উল্লেখ করেছিলেন।

তাঁর সহধর্মিনীর নাম আমাতুল মান্নান কমর সাহেবা রাবওয়ার ফযলে উমর গার্লসস্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে চারজন সন্তান দান করেছেন যারা ধর্মসেবায় সম্মুখ সারিতে রয়েছেন এবং তাদের প্রত্যেকেই সুশিক্ষিত।

তার এক মেয়ে ডাক্তার আমাতুশ শাকূর সাহেবা যিনি আমেরিকা প্রবাসী ডাক্তার আমাতুল হাফিয সাহেবের সহধর্মিনী। তিনিও নুসরত জাহাঁ স্কিমের অধীনে গাম্বিয়া এবং তাঞ্জানিয়ায় প্রায়১১বছর পর্যন্ত সেবাদান করেছেন।

শিক্ষার জগতেও তাঁর বিচরণ ছিল। তিনি ০৩টি পুস্তক রচনা করেছেন। কামূসুর রুইয়া (স্বপ্নের অভিধান) খায়াবোঁ কী তা'বীর হুরুফে আবজাদ কে লেহায সে (বর্ণাক্ষরের গাণিতিক মান অনুসারে স্বপ্নের ব্যাখ্যা), তাসাওউফরূহানী সাইন্স(সূফীবাদআধ্যাত্মিক বিজ্ঞান)-এটি তাঁর দ্বিতীয় পুস্তক। এবং তৃতীয় পুস্তক 'ইয়াদে আইয়্যাম' (পুরনো স্মৃতি), এটি তার আত্মজীবনী।

অস্ট্রেলিয়ার মিশনারী ইন্চার্জ এনামুল্ হক কাওসার লিখেন, তিনি বিনীত ও বিনম্রভাবে ছাত্রদের পাঠদান করতেন এবং তাদের দেখাশুনা করতেন। তিনি বলেন, আমি ব্রিটিশ গিয়ানাতে সফরে গেলে তিন-চারটি গ্রামে যে জামা'তগুলো তার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেখানকার পুরোনো সবাই তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং নিজেদের কাছে তার ছবি সংরক্ষিত রেখেছে। আল্লাহ্ তা'লা তার মাধ্যমে বিট্রিশ গিয়ানাতে এক শক্তিশালী জামা'ত প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

সুরিনামের মুরুব্বি সিলসিলাহ লায়েক মুশতাক সাহেব লিখেন, মাওলানা মীর গোলাম আহমদ নাসীম সাহেব গিয়ানাতে অবস্থানকালে '৬৭ থেকে '৬৯ সাল পর্যন্ত তিনবার সুরিনামে সফর করেছেন। এখানে কয়েক সপ্তাহ অবস্থান করে এই জামা'তকে নতুনভাবে সক্রিয় করে তুলেন। সে সময় বিভিন্ন কারণবশতজামা'তের অধিকাংশ সদস্য (জামা'ত থেকে)পৃথক হয়ে গিয়েছিল।আহমদী মাত্র গুটিকতক ছিল ।কেন্দ্রের সাথে তাদেরও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এহেন পরিস্থিতিতে মহতরম মওলানা গোলাম আহমদ নাসীম সাহেব গিয়ানা থেকে সুরিনাম আসেন এবং '৬৭ সালের ১৫সেপ্টেম্বর প্রথম বৈঠকের ব্যবস্থা নেন যাতে ৬ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন আর জামা'তের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপনের অঙ্গীকার করেন। সেই দিনগুলোতে পাকিস্তান থেকে মৌলভী শাহ আহমদ নূরানীও সুরিনাম এসেছিল আর জামা'তের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রদান করছিল। মওলানা নাসীম সাহেবও কয়েকটি জলসার আয়োজন করেতার আপত্তিসমূহের সদুত্তর প্রদান করেন। এছাড়াও রেডিও-তে 'হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ' বিষয়ক তিনটি প্রোগ্রাম করেন। ১৯৬৮ সালের মে মাসে দ্বিতীয় সফরকালে নির্মাণাধীন মসজিদের সাথে মিশন হাউসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। কয়েক বছরের মধ্যেই এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। লাহোরী জামা'তের ইমাম আব্দুর রহীম জাঞ্জু এবং সুন্নি জামা'তের ইমামকে ধর্মীয়বিতর্কে র চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। তিনি 'হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা' বিষয়ক কয়েকটি লিফলেটও প্রকাশ করেছিলেন।

১৯৬৮ সালের ২১ জুন জামা'তের এক সদস্যের বাসায় আয়োজিত প্রশ্নোত্তরসভা চলাকালে নৈরাজ্যবাদী মুসলমানরা জামা'তের সদস্যদের ওপর আক্রমণ করে। তিনি বর্ণনা করেন, মূল টেবিল একটি কক্ষের দরজার সামনে রাখা ছিল। মাওলানা সাহেবের ডানে-বামে উপবিষ্ট সদস্যরা তাকে ঠেলে কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। আক্রমনকারীরা জামা'তের সদস্যদের প্রচণ্ড মারধোর করে এবং কাঠের চেয়ার উঠিয়ে তাদের গায়ে ছুড়তে থাকে। এই ঘটনায় পুরুষরা ছাড়াও কয়েকজন নারীও ভীষণভাবে আহত হন। মাওলানাসাহেব কক্ষের ভিতর থেকেই চিৎকার করছিলেন, 'আমাকে বের করো, আমিও তাদের মোকাবেলা করব।'খুবই সাহসী ব্যক্তি ছিলেন। উগ্রবাদীরা মাওলানা সাহেবের একটি ব্রিফকেসও নিয়ে যায় যাতে তাঁর পাসপোর্ট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছিল। বেশ কিছুদিন পর পুলিশ সেটি উদ্ধার করে। যাহোক, এই ঘটনার পর তিনি পুরোদমে পুলিশ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে জামা'তের সদস্যদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার চেষ্টা করেন।

কালচারাল সেন্টার (তথা সংস্কৃতিক কেন্দ্রে) ইসলাম এবং সমসাময়িক সমস্যাবলী সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন। জামা'তের সদস্যদেরকে কেন্দ্রের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার জন্য উপদেশ প্রদান করেন। আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় এভাবে তার চেষ্টাসাধনার মাধ্যমে এক বিক্ষিপ্ত জামা'ত পুনরায় নিজ পায়ে দাঁড়ায়।পরবর্তীতে আগত মুবাল্লেগগণও একে আরো শক্তিশালী করেন এবং (এখন) এটি এক শক্তিশালী জামা'ত।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তান-সন্ততি ও পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে এই পুণ্যসমূহঅব্যাহত রাখুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো আমেরিকা জামা'তের প্রাক্তন আমীর মুকাররম ডাক্তার আহসানউল্লাহ জাফর সাহেবের। কয়েকদিন পূর্বে ৮১ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْن আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন। দীর্ঘসময় তিনি স্থানীয় প্রেসিডেন্ট, আমেরিকা জামা'তের নায়েব আমীর এবং ২০০২-২০১৬ পর্যন্ত আমেরিকা জামা'তের আমীর হিসাবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি অনেক গুণাবলির আধার ছিলেন। একান্ত ভালোবাসার মানুষ এবং পরম স্নেহশীল ও বড়মনের অধিকারী ছিলেন। উত্তরসূরি হিসেবে দুই মেয়ে রেখে গেছেন। তার স্ত্রী কয়েক বছর পূর্বে একটি দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন এবং ছেলেও একই দুর্ঘটনায়মারা যায়। তিনি এহেন শোকও পরম ধৈর্য ও সাহসীকতার সাথে সহ্য করেছেন এবং কখনো অভিযোগের সুরে কথা বলেন নি।

তার মেয়ে ডাক্তার হানা মরিয়ম বলেন, আমার পিতা খুবই পুণ্যবান ও ধার্মিক মানুষ ছিলেন। নামায আদায়, কুরআন পাঠ এবং চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে নিয়মিত হবার পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লার সাথে নিজের সম্পর্ক দৃঢ় করার চেষ্টায় সর্বদা লেগে থাকতেন। সারাদিনে কয়েকবার একা কিংবা বৈঠকে বসে হাত উঠিয়ে দোয়া করতেন। তিনি কখনো এটি ভাবতেন নাযে, অন্যরা আমার সম্বন্ধে কী চিন্তা করবে?জীবনের সমস্যাবলীর মাঝে তিনি নিজ সন্তানদের সর্বদা এটি শিখিয়েছেন যে, সর্বাবস্থায় খোদা তা'লার কৃতজ্ঞতা আদায় করা উচিত। আমার শ্র দ্ধেয় পিতাখিলাফতের প্র তিও পরম নিষ্ঠাবান ও নিবেদিত ছিলেন। তিনি ধর্ম, ইতিহাস এবং রাজনীতি

বিষয়েগভীর জ্ঞান রাখতেন। শেষবার হাসপাতালে যাবার সময়ও তিনি সংবাদপত্র পাঠ করেন ও আমার খুতবা শোনেন আর ইতিহাস সম্পর্কিত ইন্টারভিউ দেখেন আর আমাকেও বলেন যে, এটি দেখো। নিজের জ্ঞান ও মতামতকে অন্যদের জ্ঞান ও মতামতের ওপর কখনো প্রাধান্য দিতেন না বরং মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, অভিনিবেশ করতেন এবং বিশ্লেষণ করতেন। কুরআন করীম ও এর অনুবাদের গভীর জ্ঞান রাখতেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে কুরআন করীমের শব্দার্থ বুঝানোর পাশাপাশি এটিও বলতেন যে, এসব শিক্ষার আমাদের জীবনে প্রভাব কী? তার ব্যক্তিগত জীবনে রসূল (সা.)-এর প্রতি অগাধ ভালোবাসা চোখে পড়ত। একইভাবে তার মাঝে আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা আদায়ের গুণও বিদ্যমান ছিল। তিনি বলেন, একদিন খাবার সময় তিনি দোয়া করতে আরম্ভ করলেন। আমাদের বললেন, মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের জীবনে কখনো কখনো খাবারের এতটাই অভাব থাকতো যে, খেজুর ও রুটি সিরকায় ডুবিয়ে খেয়ে নিতেন। এতকিছু থাকার পরও আমরা আরো আধিক্যের আকাঙ্ক্ষা করি। আমাদের সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তার মাঝে অভাবীদের সাহায্য করার ভীষণ স্পৃহা ছিল।

১৯৬৭ সালে আমাদের মক্কায় যাবার সৌভাগ্য লাভ করেন। পথিমধ্যে এক ব্যক্তির প্রতি তার দৃষ্টি পড়ে যে মুখে কিছু চায় নি কিন্তু তার চোখ ক্ষুধার ছাপ ছিল আর চোখ সাহায্য প্রত্যাশী ছিল। তিনি বলেন, আমার পিতা তার কাছে যা ছিল তার মাঝ থেকে সেই ব্যক্তিকে কিছু অর্থ প্রদান করেন এবং সেই ব্যক্তি তার চোখের ইশারায় কৃতজ্ঞতা আদায় করলআর খাবারের দোকানের দিকে চলে গেল। তিনি বলেন, কয়েক বছর পূর্বে তিনি তিনটি তুর্কী কার্পেট কিনে বাড়ি নিয়ে আসেন। এটি দেখে আমার মা তাকে বলেন, আপনি অনেক দামি জিনিস নিয়ে এসেছেন। আমাদের তো এটির প্রয়োজনও ছিল না। তিনি উত্তরে বলেন, যে মহিলা আমার কাছে এটি বিক্রি করেছে তার এটিই ছিল একমাত্র আয়ের উৎস। আমি তার আবেগের প্রতি খেয়াল রেখে তাকে সাহায্য করতে চেয়েছি। অন্যের দোষ খোঁজার পরিবর্তে সর্বদা তাদের গুণ দেখতেন। নিজ সন্তানদেরও উপদেশ প্রদান করতেন যে, সমস্যার মুখে সামনে কখনো ঘাবড়ে যাওয়া উচিত নয়। সবসময় আল্লাহ্‌র কাছে সবকিছু চাওয়া উচিত এবং খোদা যা-ই দান করেন তাতে সন্তুষ্টথাকা উচিত। আমাদের সবাইকে তিনি এটিই নসীহত করতেন এবং বার বার করতেন।

ডাক্তার নাসীম রহমতউল্লাহ সাহেব তার সম্পর্কে লিখেন, আমি ১৯৮৯ সাল থেকে ডাক্তার আহসানউল্লাহ জাফর সাহেবের সাথে কাজ করছি। অনেক পুণ্যবান ও মুত্তাকী মানুষ ছিলেন। খিলাফতের প্রতি গভীর ও অগাধ ভালোবাসা পোষণ করতেন। আমেরিকার ডাক্তার মুবাশ্বের মুমতাজ সাহেব- যিনি আমেলার সদস্যদেরখুবই কোমল কণ্ঠেদিক নির্দেশনা দিতেন। কোনো প্রস্তাবে একমত না হলে তার বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থাপন করে বুঝাতেন। এমননয় যে, জোর করে নিজের আদেশ চাপিয়ে দেবেন। গুরুত্ব পূর্ণ কথা বলার সময়ও কঠোর স্বরে বলতেন না। যা বোঝাতেন তা অন্তরের অন্তঃস্তলে পৌঁছে যেত।

মির্যা এহসান লিখেছেন, খাকসার আহসানউল্লাহ জাফর সাহেবের সাথে সুদীর্ঘকাল কাজ করার সুযোগ পেয়েছে। আমীর হিসেবে জামা'তের সদস্যদেরকে খিলাফত ও জামা'তের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করাতে দেখেছি। সহজ সরল স্বভাব, সহানুভূতিশীল, শান্তি প্রিয়, দরিদ্রদের প্রতি সহানভূতিশীল এবং ভনিতা ও কৃত্রিমতা হতে পবিত্র, কৃপণতা ও লোভলালসা মুক্ত মানুষ ছিলেন। জামাত ও দরিদ্রদের জন্য নিজ ধনভাণ্ডার খুলে দিতেন। কুরআন মজীদের তফসীর এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলি পাঠে মগ্ন থাকতেন। দম্ভ, অহংকার ও আত্মশ্লাঘা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। যুগ খলীফার সামান্য অসন্তুষ্টিতেও অস্থির হয়ে যেতেন। আমি নিজেও একথার স্বাক্ষী। সামান্য কোনো বিষয়েও যদি তাকে লিখতাম, তিনি সব সময় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতেন, অস্থির হয়ে যেতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা চাইতেন এবং নির্দেশনা মোতাবেক পরিস্থি তিতে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করতেন। বইপুস্তক সংগ্রহের গভীর আগ্রহ রাখতেন। তার ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে এমন এমন দুর্লভ বই রয়েছে যে মানুষ অবাক হয়ে যাবে। কুরআন করীমের প্রতি ছিল গভীর ভালবাসা ও অনুরাগ। যে কোন সভা বা সমাবেশে সর্বদা কুরআন মজীদের আয়াত নিয়ে ভাবতেন। তার বৈঠকগুলো হতো অকৃত্রিম আর ভালবাসার সাথে সবাইকে নিজের দিকে অকৃষ্ট হতো। নিজের জন্যতিনি কখনো কোনো প্রোটোকল নির্ধারণ করেননি। খুবই সাদাসিধা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন।

জহির বাজওয়া সাহেব লিখেছেন, একজন বন্ধু আমাকে বলেছেন, ডাক্তার আহসানউল্লাহ সাহেব চুপচাপ মসজিদে আসতেন। যখন কেউ থাকতোন একা একা মসজিদ ও বাথরুম পরিষ্কার করতেন। তার কাছে এর কারণ জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, এর মাধ্যমে আমার আত্মা পরিশুদ্ধ করার সুযোগ পাই। খুবই বিনয়ী ছিলেন। অতঃপর তিনি লিখেছেন, ডাক্তার সাহেবের খোদার প্রতি ভালোবাসা, মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে ভালোবাসা এবং খলীফাগণের প্রতি তার ভক্তি ছিল অনুকরণীয়। কুরআন করীমের প্রতি তার ভালোবাসা ছিল বর্ণনাতীত। তিনি বলেন, যখনই আমরা গাড়িতে বসতাম তখন কুরআন করীমের সিডি লাগানো থাকত এবং ঘরেও সর্বদা এমটিএ চলতে থাকত। যখনই মসজিদ বাইতুর রহমানে আসতেন সর্বদা এমটিএ বা তিলাওয়াত লাগিয়ে দিতেন। তার ঘরে সর্ব ত্র কেবল কুরআনই কুরআন ও তফসীরসমূহ বিদ্যমান। সব কক্ষের আলমারিতে বিপুল পরিমাণ বইপুস্ত ক বিদ্যমান ছিল। শুধু বিদ্যমানই ছিল না, তিনি নিয়মিত সেগুলো অধ্যয়নও করতেন।

ছাত্রজীবনে তিনি যখন রাবোয়ায় পড়াশুনা করতেন ডাক্তার সাহেবের মায়ের ইচ্ছা ছিল ডাক্তার সাহেব যেন দৈনিক হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এবং হযরত মাওলানা গোলাম রসূল সাহেব রাজেকীর সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাদের কাছে দোয়ার আবেদন করেন। ডাক্তার সাহেব বলেন, আমি যথাসম্ভব এ চেষ্টা করতাম। শিক্ষাক্ষেত্র ও তরবিয়তের ক্ষেত্রেও আমার সাফল্যের পেছনে এ দু'জন বুযুর্গের হাত রয়েছে। সবাইকে ভালোবাসতেন। কিন্তু দরিদ্র আহমদীদের প্র তি তার চেখে আমি যে বিশেষ ভালোবাসা দেখেছি তা বণনাতীত। তিনি কখনো কারো অমঙ্গলের কথা ভাবতেই পারতেন না। কিন্তু যেসব স্বচ্ছল আহমদী জামা'তের জন্য কুরবানীতে অগ্রসর হতো না তাদের ব্যাপারে ডাক্তার সাহেবের হৃদয়ে সংশয় বিরাজ করতোএবং কখনো কখনো তিনি তা প্রকাশও করতেন। তার গভীর বাসনা ছিল যেন সব আহমদী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মর্যাদা অনুধাবন করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণীকে বুঝে, অবলম্বন করে এবং তা ছড়িয়ে দেয়- এ উদ্দেশ্যে তিনি নতুন নতুন পদ্ধতিও চিন্তা করতেন এবং কখনো কখনো আমাকেও লিখতেন। মসজিদ নির্মাণের প্রতি তার অনেক দৃষ্টি ছিল। তার যুগে বেশ কিছু মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। দোয়ার প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস ছিল। একবার আমেলার মিটিংয়ে কোনো একজন এমন একটি কথা বলে বসে যার মাধ্যমে দোয়ার মাহত্ব খাটো করা হচ্ছে বলে মনে হয়। তিনি বলেন, আমি তাকে আমেলার মিটিংয়ে কখনো এত রাগ করতে পূর্বে দেখি নি যতটা এ সময়ে দেখেছিলাম। অত্যন্ত সরল জীবনযাপন করতেন, তার একমাত্র শখ ছিল মসজিদ নির্মাণের। সবার সব কথা মানতেন কিন্তু মসজিদ নির্মাণ না করার বিষয়কে তিনি খুব অপছন্দ করতেন। যতদিন তার স্বাস্থ্য ভালো ছিল প্র ত্যেক বৃহস্পতিবারে উলিংব্র'র পুরো বায়তুন নাসের মসজিদ নিজেই পরিষ্কার করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে সবসময় বড় বড় আর্থি ক কুরবানী করার তৌফিক দান করেন।

আমেরিকা জামা'তের বর্তমান আমীর মির্যা মাগফুর আহমদ সাহেব লিখেন, ডাক্তার আহসানউল্লাহ জাফর সাহেবকে আল্লাহ্ তা'লা একটা দীর্ঘসময় পর্যন্ত প্রথমে নায়েব আমীর, এরপর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আমেরিকার আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালনের তৌফিক দিয়েছেন। (হুযূর বলছেন) আমার সফরের সময় অর্থাৎ তিনি যখন আমীর ছিলেন তখন তিনবার আমি আমেরিকা সফর করেছিলাম আর সে সময়ে তিনি অত্যন্ত সুচারুরূপে পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করেন। তিনি বলেন, বেশ কয়েক বছর ধরে অসুস্থতার কারণে তার চলাফেরায় সীমিত হয়ে যায়, তারপরও এমারতের দায়িত্ব খুব সানন্দে ও নিষ্ঠার সাথে পালন করতে থাকেন। তার কথাবার্তা অধিকাংশ সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতির আলোকে হতো। কথাবার্তায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি উপস্থাপন করতেন আর তাঁর পুস্তকের রেফারেন্সের আলোকে বলতেন। হুযূর (আ.)-এর সাথে তার এক বিশেষ সম্পর্কের প্রকাশ পেত। খিলাফতের সাথে গভীর আনগত্যের সম্পর্ক ছিল। আমেরিকার বর্তমান আমীর সাহেব আমাকে আরো লিখেন, আপনার সমস্ত দিকনির্দেশনা যা আসত তা দ্রুত জামা'তের সদস্যদের কাছে পৌঁছানোর তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন। যাহোক, আমিও দেখেছি যেভাবে আমি উল্লেখ করেছি তার মাঝে খিলাফতের আনুগত্য ছিলঅসাধারণ। নিজের মতামত ছেড়ে দিতেন আর হাসিমুখে ছেড়ে দিতেন।

আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন। তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার সন্তানদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা তাঁর স্বীয় নিরাপত্তার রাখুন এবংতার পুণ্যসমূহ ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

****

যুগ ইমামের বাণী

যাঁর আশিস ও কল্যাণের ধারা সদা প্রবাহমান, তিনিই হলেন জীবিত নবী। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantapur, 24 PGS (S)

হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর জার্মানী সফর, ২০২৩ (সেপ্টেম্বর)

জলসা সালানায় হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমাপনী ভাষণ

(শেষাংশ....)

হুযুর আনোয়ার বলেন: ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধের জন্য আঁ হযরত (সা.) কিভাবে সাহায্য করতেন, বিশেষ করে যারা ধর্মের কারণে ত্যাগ স্বীকার করেছে? এ সম্পর্কে হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) -এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর পিতা উহদের যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি ছয় কন্যা রেখে যান। সেই সঙ্গে তাঁর কিছু দেনাও ছিল। যখন তার বাগানের খেজুর পাড়ার সময় এল, তখন আমি আঁ হযরত (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি তো জানেনই যে আমার পিতা উহদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তিনি বেশ কিছু নিজের ঋণ রেখে গেছেন। আমি চাই আপনি আসুন, ঋণদাতা আপনাকে দেখে যদি ঋণে কিছুটা ছাড় দেয়। আঁ হযরত (সা.) বললেন, বেশ যাও, তোমার বাগানের বিভিন্ন মানের পাকা খেজুরের পৃথক পৃথক স্তুপ তৈরী কর। হযরত জাবির বলেন, আমি ফিরে এসে এমনটাই করি। এরপর আঁ হযরত (সা.) কে ডেকে আনার জন্য আসি। ঋণদাতা যখন দেখল যে আঁ হযরত (সা.) এসেছেন, তখন সে ঋণ ফেরত নেওয়ার জন্য আরো বেশি জোরাজুরি করতে শুরু করল। আঁ হযরত (সা.) তার এই অবস্থা দেখে খেজুরের সব থেকে বড় স্তুপটির চারদিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করার বসে পড়েন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, তোমার ঋণদাতাকে ডাক। অতঃপর তিনি সেই স্তুপটি থেকে মেপে মেপে খেজুর দিতে শুরু করলেন, যার যত ঋণ ছিল তাদেরকে সেই মত দিতে লাগলেন। হযরত জাবির বলেন, এইভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমার পিতা সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দেন। খোদার কসম! তা'লা আমার পিতার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দিক, আর আমি বোনেদের কাছে একটা খেজুরও যদি না নিয়ে যেতাম তবে আমি তাতেও সন্তুষ্ট ছিলাম। কিন্তু যতগুলি স্তুপ সেখানে পড়ে ছিল, আঁ হযরত (সা.)-এর দোয়ার কল্যাণে সবই অবশিষ্ট থেকে যায়। আর খোদার কসম আমি সেই স্তুপটির দিকে চেয়ে ছিলাম যার উপর আঁ হযরত (সা.) বসেছিলেন। সেটির কোন নড়চড় হয় নি, তার মধ্য থেকে একটি খেজুরও কমে যায় নি। যারা ধর্মের পথে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, তাদের সন্তানদের প্রতি এই ছিল আঁ হযরত (সা.)-এর স্নেহ ও দয়া। তিনি তাদের জন্য দোয়া করেন। যার পরিণামে ঋণও পরিশোধ হয়ে যায়। ঋণদাতার কাছে সময় নেন নি, বরং ঋণ পরিশোধ করেন এবং তাঁর সন্তানেরাও সম্পদ থেকে লাভবান হয়েছে।

ইসলামের ইতিহাসে সাধারণ মানুষের অধিকার প্রদানের জন্য খলীফাগণ যে প্রচেষ্টা করেছেন, হযরত উমর (রা.)-এর যুগে যে সব প্রয়াস করা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ পাওয়া যায়।

হযরত উমর (রা.) জনসাধারণের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য অনেক কাজ করেছেন। কৃষিকাজের উন্নতি এবং জনগণের জন্য পানি সরবরাহের জন্য ক্যানেল খনন করেন। আবু মুসা নহর: দাজলা নদী থেকে নয় মাইল দীর্ঘ খাল কেটে বসরা পর্যন্ত নিয়ে আসা হয়। মুয়াক্কল নহর: এটিও দাজলা নদী থেকে বের করা হয়। আমীরুল মোমেনীন নহর: হযরত উমর (রা.)-এর নির্দেশে নীল নদকে লোহিত সাগরের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। অষ্টদশ হিজরীতে আরব অনাবৃষ্টির সম্মুখীন হলে হযরত উমর (রা.) হযরত আমার বিন আস (রা.) কে সহায়তার জন্য পত্র লেখেন। দূরত্ব বেশি হওয়ার কারণে সহায়তা করতে বিলম্ব হয়। হযরত উমর (রা.) আমার (রা.) কে ডেকে বলেন, নীল নদকে লোহিত সাগরে মিশিয়ে দেওয়া হলে আরবে কখনও জলের সংকট হবে না। আমার (রা.) ফিরে গিয়ে ফুসতাত থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত খাল খনন করেন যার মাধ্যমে সামুদ্রিক জাহাজগুলি মদিনা বন্দরে পৌঁছে যেত। এই খালটি ২৯ মাইল দীর্ঘ ছিল আর তা ছয় মাসের মধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছিল।হযরত আমার বিন আস (রা.) স,,,,,,,,, সাগর ও লোহিত সাগরকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা করেন। এবং 'ফারমা' নামক স্থানে, যেখানে ,,,,,,, সাগর ও লোহিত সাগরের মাঝে দূরত্ব সত্তর মাইল ছিল, উভয় সাগরকে যুক্ত করতে চাইলেন। কিন্তু এই পথে গ্রীক (দস্যু) দের হাতে হাজীদের লুণ্ঠিত হওয়ার আশঙ্কায় হযরত উমর (রা.) এই প্রস্তাবে রাজি হলেন না। হযরত আমার (রা.) অনুমতি পেলে সুইজ খালে উদ্ভাবন আরবদের অংশে আসত।

হযরত উমর (রা.) জনসাধারণের সুবিধার্থে বিভিন্ন ভবন নির্মাণ করিয়েছিলেন। বর্তমান যুগে ইউরোপের জন্য বলা হয় যে, তারা মানুষের সুবিধার্থে অনেক কাজ করে। ইসলামে সর্বপ্রথম এই সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আজ মুসলমান দেশগুলি যদি এই দিকে দৃষ্টি দেয় এবং এই শিক্ষার উপর আমল করা শুরু করে, তবে তাদের মধ্যেকার যাবতীয় বিবাদ-বিসম্বাদের অবসান হবে। হযরত উমর (রা.) যে সব ভবন তৈরী করিয়েছিলেন, তার মধ্যে যেমন মসজিদ ছিল, তেমনি আদালত ভবন, সেনা ছাউনি, অতিথিখানা, দেশের নির্মাণ কার্জের জন্য বিভিন্ন অফিস, রাস্তাঘাট, সেতু প্রভৃতি। মদিনা থেকে মক্কা পর্যন্ত প্রত্যেক মঞ্জিলে জলাশয়, সরাইখানা নির্মাণ করান, এবং সেনা চৌকিও তৈরী করেন। জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষায় বাজারের মূল্য নিয়ন্ত্রণে অনেক সময় সরকারের পক্ষ থেকে কিছুটা সীমা পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করারও বৈধ হয়ে পড়ে। ইসলামে দ্রব্যমূল্য জোর করে হ্রাস করে দেওয়া নিষিদ্ধ। কারণ এতে মানুষের ক্ষতি হতে পারে আবার ব্যবসায়ীদেরও ক্ষতি হতে পারে আর এর ফলে অরাজকতা সৃষ্টি হয়। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এক স্থানে এর বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন-

'ইসলাম মাত্রারিক্ত সীমা পর্যন্ত দ্রব্যমূল্য হ্রাস করতেও নিষেধ করেছে। দ্রব্যমূল্য হ্রাস করারও অবৈধ সম্পদ অর্জনের মাধ্যম হয়ে থাকে। কেননা ক্ষমতাবান বণিক অপেক্ষাকৃত দুর্বল বণিকদের স্বল্পমূল্যে পণ্য বিক্রয় করতে বাধ্য করে তাদেরকে সর্বস্বান্ত করতে সফল হয়ে যায়। হযরত উমর (রা.)-এর যুগের একটি ঘটনা থেকে জানা যায় যে, তিনি (রা.) বাজার পরিদর্শন করছিলেন। সেই সময় তিনি দেখলেন, বহিরাগত এক ব্যক্তি খুব কম দামে শুকনো আঙুর বিক্রি করছে, যে দামে মদিনার ব্যবসায়ীরা বিক্রি করতে পারত না। হযরত উমর (রা.) তাকে নির্দেশ দিলেন, নিজের পণ্য নিয়ে এখান থেকে নিয়ে যাও কিম্বা সেই দামেই বিক্রি কর যে দামে মদিনার ব্যবসায়ীরা বিক্রি করছে। হযরত উমর (রা.) কে এমন নির্দেশ দানের কারণ জানতে চাওয়া হলে তিনি (রা.) উত্তর দেন, যদি এভাবে বিক্রি করার অনুমতি দেওয়া হয় তবে মদিনার ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হবে, যারা কি না ন্যায্যমূলে বিক্রি করছে। কতক সাহাবা অবশ্য হযরত উমর (রা.)-এর এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে হযরত রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর উক্তি উপস্থাপন করেন যাতে তিনি (সা.) বলেন, 'বাজারমূল্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।' কিন্তু এই আপত্তি সঙ্গত ছিল না। কেননা বাজারমূল্যে হস্তক্ষেপ করার অর্থ হল 'উৎপাদন ও চাহিদা'-এর নীতিতে হস্তক্ষেপ করা আর এমনটি করা নিঃসন্দেহে ক্ষতিকর এবং এর থেকে সরকারের বিরত থাকা উচিত। অন্যথায় জনসাধারণের কোন উপকার হবে না আর ব্যবসায়ীরা শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে দ্রব্যমূল্যে হস্তক্ষেপ করা হয় নি। ইসলাম এই সীমা পর্যন্ত সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার শিক্ষা দেয়।

হযরত উমর (রা.) শাসক ও সাধারণ মানুষের কর্তব্যের বিষয়ে এক স্থানে বর্ণনা করেছেন। হযরত সালমা বিন শাহাব আবদি (রা.) বলেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) বলেন-

হে জনসাধারণ! তোমাদের উপর আমাদের কিছু অধিকার আছে আমাদের অনুপস্থিতিতেও তোমরা আমাদের প্রতি হিতৈষামূলক আচরণ করবে। জনসাধারণ প্রশাসনের প্রতি হিতৈষামূলক আচরণ করা এবং হিতৈষামূলক কাজে আমাদের সাহায্য করা প্রশাসনের অধিকার। আর আল্লাহ্‌র নিকট নেতার প্রতি বিনম্রতা ও কোমলতা বেশি প্রিয় এবং কল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর ইমামের অজ্ঞতা এবং কঠোরতা আল্লাহ্ তা'লার নিকট বেশি প্রিয় আর ইমাম বা আমীরের কাজ হল নম্রতা ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করা, কঠোরতা করা উচিত নয়, কেননা এটা অজ্ঞতা।

হুযুর আনোয়ার বলেন: তাই ইসলাম যেখানে মানুষকে আইনের গণ্ডিতে থাকার উপদেশ দিয়েছেন, তেমনি আমীর বা প্রশাসককেও তাদের অধিকার প্রদানের উপদেশ দিয়েছে। ইসলামী শাসনে কিভাবে মানুষের অধিকার রক্ষা করা হত সে সম্পর্কে আবু কবীল এর পক্ষ থেকে একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। হযরত আমীর মুয়াবিয়া প্রজাদের কল্যাণার্থে আবুল জায়েশ নামে এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেছিলেন। সেই ব্যক্তি প্রতিদিন বিভিন্ন মজলিস পরিদর্শন করত এবং জানতে চাইত যে কারো পরিবারে সন্তান জন্ম নিয়েছে কি না কিম্বা কারো পরিবারে অতিথি এসেছে কি না। সে সংবাদ নিয়ে রেজিস্টারে লিখে নিত যাতে তার খাদ্যের ব্যবস্থা করা যায়। বর্তমান যুগের মুসলমানেরাও যদি এই সত্যকে উপলব্ধি করত আর এই অধিকার প্রতিষ্ঠিত করত তবে শান্তিও প্রতিষ্ঠিত হত। একে অপরের বিরুদ্ধে খড়্গ হস্ত না হয়ে যদি নিজেদের কথা ও কাজের মাধ্যমে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষাকে মানুষের সামনে তুলে ধরত! কিন্তু তাদের বুদ্ধি জাগ্রত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না যুগ ইমামকে তারা মান্য করে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিবেক বুদ্ধি দান করুন।

খোদা তা'লা আমাদেরকে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে এই সকল অধিকার অনুধাবন করার এবং আমাদের নিজেদের উপর অর্পিত অধিকার সমূহ প্রদান করার তৌফিক দান করুন। বিভিন্ন সময়, যেমনটি আমি বলেছিলাম, অধিকারের বিবরণ আমি তুলে ধরছি, ইসলাম যে বিবরণের সাথে অধিকারসমূহ বর্ণনা করেছে এবং প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের অধিকার বর্ণনা করেছে, এখনও পর্যন্ত এই কয়েক বছরে প্রায় ২৫টি অধিকারের বিষয়ে আমি বর্ণনা করেছি। এই সমস্ত অধিকার প্রদান করাই সেই মূল নীতি যা প্রত্যেক শান্তিপূর্ণ সমাজ এবং পৃথিবরি শান্তির জন্য নিশ্চয়তা দান করে। আর ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা এত সূক্ষ্মভাবে এই সকল অধিকারের বিষয়ে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব প্রত্যেক আহমদীকে একদিকে যেমন নিজেদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টির মাধ্যমে অধিকার প্রদানের বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত, অপরদিকে এই শিক্ষাকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়ার দরকার। জগতকে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করা প্রয়োজন এবং অমুসলিমদেরকেও এই শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করা দরকার।

অতএব আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের এই শিক্ষা অনুধাবন করতে হবে। আর এর জন্য চেষ্টাও করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন। এখন আমরা দোয়া করব, আল্লাহ্ তা'লা জলসায় অংশগ্রহণকারী সকল অতিথিদেরকে নিরাপদে নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছে দিন। তারা যা কিছু এখানে শিখেছে , শুনেছে এবং বুঝেছে সেগুলিকে যেন নিজেদের জীবনের অংশে পরিণত করতে পারে, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এর তৌফিক দান করুন। আমি এটাও বলব যে, এখন তো সরকারের পক্ষ থেকে এটাই ঘোষণা হয়েছে যে, কোভিড মহামারি জার্মানী থেকে বিদায় নিয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি আমি কতকের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি যে, তারা কোভিডে আক্রান্ত। এই কারণে সাধারণত প্রত্যেককেই সতর্কভাবে চলা উচিত আর এদেশে যদি সরকারের পক্ষ থেকে হোমিওপ্যাথি ওষুধ নিষিদ্ধ না থাকে তবে নিজের মত করে সেবন করতে পারে এবং করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা সকলকে এর থেকে নিরাপদ রাখুন এবং স্বীয় নিরাপত্তা বেষ্টনীতে আশ্রয় দিন এবং নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দিন। দোয়া করে নিন।

(২পাতার পর.....)

(রা.)ও এই রেওয়ায়েতটিকে প্রয়োজনে বাধ্যবাধকতার সময় বৈধ আখ্যায়িত করেছেন। এই পদ্ধতিকে স্থায়ীরূপ দেওয়া আমার মতে সঠিক নয়।

প্রশ্ন: যখন আমাদের মৃত্যু হয় তখন দুই জন ফিরিশতা প্রশ্ন করে যে, তোমার ধর্ম কি, তোমার নবী কে এবং তোমার উপাস্য কে? আর আমাদেরকে মৌখিকভাবে এর উত্তর দিতে হবে এর পর আত্মা উত্তোলিত হবে। এটা কি সত্য?

হুযুর আনোয়ার বলেন: কবরে প্রশ্নোত্তর করা এবং কবরের আযাব সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়াত হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। আপনি যে প্রশ্ন করেছেন সে সম্পর্কে সুনান আবু দাউদে একটি রেওয়াত বর্ণিত হয়েছে। হযরত বারাআ বিন আযিব (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা রসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে এক আনসার সাহাবীর জানাযার সঙ্গে বের হই। একটি কবরে পৌঁছই যেখানে তখনও 'লাহাদ' তৈরী হয় নি। রসুলুল্লাহ্ (সা.) সেখানে বসে পড়েন আর আমরাও নীরবে তাঁর চারপাশে বসে পড়ি, যেন আমাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে। তাঁর হাতে একটি কাঠের টুকরো ছিল যেটা দিয়ে তিনি মাটিতে আঁচড় কাটছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা তুলে তিন বার বললেন, কবরের শাস্তি থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা কর। (এই রেওয়ায়েতের এক বর্ণনাকারীদের মধ্যে একজন হলেন জারির) সেই সময় আঁ হযরত (সা.) একথাও বলেছিলেন যে, কোন মৃত ব্যক্তিকে যখন দাফন করে লোকেরা ফিরে যায়, তখন মৃত তাদের জুতোর শব্দ শুনতে পায়। সেই সময় মৃতকে প্রশ্ন করা হয়। হে ব্যক্তি! তোমার রব্ব কে, তোমার ধর্ম কি এবং তোমার নবী কে? (বর্ণনাকারীদের মধ্যে একজন হানাদ বলেন) হুযুর (আ.) বলেন, তার কাছে দুইজন ফিরিশতা এসে তাকে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করে, তোমার প্রভু-প্রতিপালক কে? সে উত্তর দেয় আমার রব্ব তথা প্রভু-প্রতিপালক হলেন আল্লাহ। সেই দুই ফিরিশতা তাকে প্রশ্ন করে, তোমার ধর্ম কি? সে উত্তর দেয়, আমার ধর্ম ইসলাম। তারা দুজনে বলে, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি আবির্ভূত হয়েছিল? সে উত্তর দেয়, 'তিনি হলেন, রসুলুল্লাহ্।' তারা দুজনে জিজ্ঞাসা করে, তোমরা কিভাবে জানতে পারলে? সে উত্তর দেয়, আমি আল্লাহ্র কিতাব পাঠ করেছি, এর উপর ঈমান এনেছি এবং তা সত্যায়ন করেছি। (জারির এর রেওয়াতে আরও সংযোজন করা হয়েছে) আল্লাহ্ তা'লার বাণী- يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ এ র এটাই অর্থ। হুযুর (সা.) বলেন, অতঃপর আকাশ থেকে ধ্বনি আসে, আমার বান্দা সত্য বলেছে। অতএব এর জন্য জান্নাতের বিছানা প্রস্তুত কর, এর জন্য জান্নাতের দিক থেকে একটি দরজা খুলে দাও এবং তাকে জান্নাতের বস্ত্র পরিধান করাও। হুযুর (সা.) বলেন: এরপর তার কাছে জান্নাতের বাতাস ও সৌরভ আসে এবং তার কবর দিগন্ত পর্যন্ত প্রশস্ত করা হয়। তিনি (সা.) বলেন, কাফের যখন মারা যায়, তখন তারা আত্মাকে শরীরে ফেরানো হয়। দুই জন ফিরিশতা তার কাছে এসে তাকে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করে, তোমার রব্ব বা প্রতিপালক কে? সে উত্তর দেয়, আমি জানি না। তারা জিজ্ঞাসা করে, তোমার ধর্ম কি? সে উত্তর দেয়, আমি জানি না। তারা জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের মাঝে কোন ব্যক্তিকে প্রেরণ করা হয়েছিল। সে উত্তর দেয়, আমি জানি না। তখন আকাশ থেকে ধ্বনি ভেসে আসে, সে মিথ্যা বলেছে, তাই এর জন্য আগুনের বিছানা প্রস্তুত কর এবং তাকে আগুনের পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্য জাহান্নামের দিক থেকে একটি দরজা খুলে দাও। হুযুর (সা.) বলেন, জাহান্নামের উত্তাপ ও উত্তপ্ত বাতাস তার কাছ দিয়ে যায় এবং তার কবরকে এতটাই সংকীর্ণ করে দেওয়া হয় যে, তার বুকের পাঁজরের অস্থিগুলি একে অপরের সঙ্গে জুড়ে যায়। (জারির এর রেওয়ায়েত সংযোজন করে বলা হয়েছে) এরপর একজন অন্ধ ও বধির ফিরিশতা নিযুক্ত করা হয়, যার কাছে লোহার এমন একটা মুগুর থাকে যেটিকে পর্বতের উপর আঘাত করলে সেটাও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। ফিরিশতা সেই মৃতকে সেই মুগুর দ্বারা প্রহার করে, যার শব্দ পূর্ব থেকে পশ্চিমের জিন ও মানুষ ছাড়া সকলেই শুনতে পায়। এইরূপে সেই মৃত মাটিতে পরিণত হয়। এরপর পুনরায় তার মধ্যে আত্মা সঞ্চার করা হয়।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ)

এই রেওয়াতের বিষয়ে একথাও স্মরণ রাখা জরুরী যে, এতে বর্ণিত বিষয়গুলি অধিকাংশই রূপক।এর পুরোটাকেই বাহ্যিকভাবে নেওয়া সঠিক হবে না। কবরের প্রসঙ্গে কুরআন করীমে একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ (সূরা আবাসা: ২২) অর্থাৎ আল্লাহ তা'লা মানুষকে মৃত্যু দিলেন। অতঃপর তিনি তাকে কবরে রাখলেন। অথচ আল্লাহ্ তা'লা তাকে কবরে রাখে না, মানুষই অপর মানুষকে কবরে দাফন করে। আবার অনেকন এমন মানুষও আছে যাদের এই পৃথিবীতে কবরই তৈরী হয় না। তাই এখানে সেই কবরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা আল্লাহ্ তা'লা মানুষের মৃত্যুর পর পরকালের জীবনে প্রস্তুত করেন। যেমন হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেন- এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, পৃথিবীতে মানুষকে তারা আত্মীয়স্বজনেরা কবরে রাখে। কিন্তু মানুষের প্রকৃত কবর সেটি যেখানে আল্লাহ্ তা'লা মানুষের আত্মা রেখে দেন। (তফসীর সগীর, পৃ: ৮০৩)

তাই যেমনটি আমি বলেছি, এগুলি সব আধ্যাত্মিক ও রূপক কথাবার্তা। ইহজগতের জীবনাবসানের পর আল্লাহ্র নিকট শাস্তি ও পুরস্কারের জন্য মানুষ যখন উপস্থিত হবে, তখন এগুলি প্রকাশ পাবে। আর পরকালে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রাপ্য পুরস্কার ও প্রতিদানের অশেষ ভাণ্ডার, সেগুলির গুরুত্ব, অনুরূপভাবে এই জগতের অপকর্মসমূহের পরিণামে পরকালের জীবনে প্রাপ্য শাস্তির তীব্রতা প্রকাশ করতে এবং মানুষের মধ্যে সেই কষ্ট ও যন্ত্রণার অনুভূতি তৈরী করতে এই ধরণের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্ন: জনৈক ভদ্রমহিলা জন্মের পূর্বেই তার মেয়ের মৃত্যু সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে লিখেছেন। হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখের পত্রে তার এসব প্রশ্নের নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন।

হুযূর বলেন: যে মেয়ে জন্মের পূর্বেই মারা গেছে তার ছবি বাড়িতে ঝুলিয়ে রাখলে এটি নিজেকে আরও বেশি কষ্ট দেওয়ার কারণ হবে। আর এমনিতেই এই বাচ্চা যেহেতু জন্মের আগেই মারা গিয়েছিল তাই হয়ত তার ছবি এতটা সুস্পষ্টও হবে না বরং (এই ছবি) অন্য বাচ্চাদের জন্য ভীতির কারণ হবে। তাই সেই মেয়ের ছবি বাড়িতে ঝুলানোর কিংবা নিজের কাছে রাখার কোন প্রয়োজন নেই।

জন্মের পূর্বেই মৃত্যুবরণকারী বাচ্চাদের সাধারণত গোসল করানো হয় না আর তাদের জানাযাও পড়ানো হয় না। কিন্তু কোন পিতামাতা যদি তাদের আত্মিক প্রশান্তির জন্য এমনটি করতে চায় তাহলে এতে দোষের কিছু নেই।

কবরস্থানে যাওয়ার যতটুকু সম্পর্ক, আপনি মেয়ের কবরে গিয়ে যদি ধৈর্যধারণ করতে পারেন আর প্রতিদিন কবরস্থানে যাওয়ার ক্ষেত্রে আপনার নিজের এবং পরিবারের

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)

লোকদের কোন সমস্যা না হয় তাহলে প্রথমদিকে কিছুদিন কবরস্থানে গিয়ে দোয়া করার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু সেখানে গেলে যদি আপনার শরীরের ওপর তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয় তাহলে প্রতিদিন কবরস্থানে যাওয়ার পরিবর্তে বাড়িতে বসেই তার জন্য দোয়া করুন। আর স্মরণ রাখবেন, এই মেয়ে মূলত আপনার কাছে আল্লাহ্‌র একটি আমানত ছিল যা তিনি আপনাকে এতটুকু সময়ের জন্যই (হয়ত রাখতে) দিয়েছিলেন কিন্তু সেই সময় ফুরিয়ে গেলে তিনি তাঁর আমানত ফেরত নিয়ে যান। কাজেই, এটিকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা জ্ঞান করে এক্ষেত্রে আপনার ধৈর্য ধারণ করা উচিত।

প্রশ্ন: একজন ভদ্রমহিলা হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে লিখেছেন, অ-আহমদী মুসলমান-যাদের মধ্যে আমার পরিবারের লোকজনও আছে, তারা আপত্তি করে যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) স্বয়ং লিখেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার সকল বইপুস্তক তিনবার পাঠ করে নি সে (সত্যিকার অর্থে) আমার দাবি সম্পর্কে বোঝে না।' এরপর তারা জানতে চায় যে, সব আহমদী কি এসব বইপুস্তক তিনবার করে পাঠ করেছে? এর কি উত্তর দিতে হবে?

হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ২০শে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখের পত্রে এই প্রশ্নের নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন।

হুযূর বলেন: হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কোথাও একথা লিখেন নি যে, যে ব্যক্তি আমার সকল বই-পুস্তক তিন বার করে পাঠ করেনি সে আমার দাবি সম্পর্কে বুঝে না। বরং হুযূর (আ.) একথা বলেছেন, "আর সে-ই ব্যক্তি, যে খোদার মনোনীত ও প্রেরিত পুরুষের কথামালা অভিনিবেশ সহকারে শোনে না এবং তাঁর রচনাবলি মনোযোগ দিয়ে পড়ে না সে-ও অহংকার থেকে একটি অংশ লাভ করেছে। কাজেই, অহংকারের কোন অংশ যেন তোমাদের মাঝে না থাকে সেই চেষ্টা করো, যাতে ধ্বংস না হও এবং তোমরা নিজেদের পরিবার-পরিজন সহ নাজাত বা মুক্তি লাভ করতে পারো।"

(নযূলুল মসীহ্, রূহানী খাযায়েন, অষ্টাদশ খণ্ড, পৃ. ৪০৩)

মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই নির্দেশনা অনুযায়ী, যাদের জাগতিক বই-পুস্তক ও জ্ঞানের প্রতি গভীর

মনোযোগ থাকে ঠিকই কিন্তু ধর্মীয় বই-পুস্তক ও জ্ঞানের প্রতি মনোযোগ থাকে না তাদের মধ্যে এক প্রকার অহংকার পাওয়া যায়, কেননা তারা পার্থিব জ্ঞানকেই যথেষ্ট মনে করে; অথচ মানুষের নাজাত বা মুক্তির জন্য ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা একান্ত আবশ্যক। আর ধর্মীয় জ্ঞান ধর্মীয় পুস্তকাদি পাঠ করলেই অর্জন করা সম্ভব।

হুযূর (আ.) তাঁর রচিত হাকীকাতুল ওহী পুস্তক পাঠের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে একস্থানে বলেন, "আমাদের বন্ধুদের হাকীকাতুল ওহী (পুস্তকটি) আগাগোড়া মনোযোগ দিয়ে পাঠ করা উচিত বরং এটি মুখস্ত করা উচিত। (তাহলে) কোন মৌলভী তাদের সামনে টিকতে পারবে না, কেননা সকল প্রকার প্রয়োজনীয় বিষয় এতে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বিভিন্ন আপত্তির উত্তরও (এতে) দেওয়া হয়েছে।"

(মালফুযাত, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২৩৫, ১৯৮৮ সালের সংস্করণ)

কাজেই, একথা যদি সত্য হতো, অর্থাৎ যে ব্যক্তি হুযূর (আ.)-এর সকল বই-পুস্তক তিনবার করে পড়ে নি সে (তাঁর) দাবি সম্পর্কে বুঝতে পারবে না তাহলে হুযূর (আ.) কেবল হাকীকাতুল ওহী পুস্তকটি একবার মনোযোগ দিয়ে পাঠ করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতেন না বরং বলতেন, এটিও অন্যান্য পুস্তকের মতো তিন বার করে পাঠ করুন।

হুযূর (আ.) স্বয়ং কোথাও একথা লিখেন নি, তবে সীরাতুল মাহদীতে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে, "হযরত সাহেব বলতেন, যে ব্যক্তি আমাদের বই-পুস্তক কমপক্ষে তিনবার করে পাঠ করে নি তার মধ্যে এক ধরনের অহংকার পাওয়া যায়।"

(সীরাতুল মাহদী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৬৫, রেওয়ায়েত নম্বর: ৪১০)

আর এই রেওয়ায়েতের অর্থও তাই যা আমি ওপরে বর্ণনা করেছি, অর্থাৎ ধর্মীয় পুস্তকাদি বাদ দিয়ে কেবল জাগতিক বই-পুস্তক পাঠ করা এবং ধর্মীয় জ্ঞানকে উপেক্ষা করে কেবল পার্থিব জ্ঞান অর্জনকে প্রাধান্য দেওয়া মূলত মানুষের অহংকারের পরিচয় বহণ করে। কাজেই, প্রত্যেক আহমদীকে বেশি বেশি রূহানী খাযায়েন থেকে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

প্রশ্ন: একজন ভদ্রমহিলা হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে জানতে চেয়েছেন, জুমুআর খুতবার শেষদিকে ইমাম সাহেব নীচে বসেন এবং আবার দাঁড়িয়ে সানী খুতবা প্রদান করেন, তিনি এমনটি কেন করেন? হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখের পত্রে এ বিষয়ে নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন।

হুযূর বলেন: এটি মহানবী (সা.)-এর সুন্নত বা রীতি। যেমন, বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে মহানবী (সা.)-এর জুমআর খুতবা প্রদানের রীতি বা পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে, তিনি (সা.) প্রথমে দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করতেন এবং তাঁর ওয়াজ-নসীহত তথা তাঁর বক্তব্য ও উপদেশ ইত্যাদি প্রদান করা শেষ হলে তিনি কিছুক্ষণের জন্য নীরবে নীচে বসতেন, এরপর পুনরায় দাঁড়িয়ে সানী খুতবা প্রদান করতেন। বিভিন্ন আলেম ওলামা এর যে কারণ বর্ণনা করেছেন তা সম্ভবত, এর মাধ্যমে উভয় খুতবার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা।

তবে, এর পাশাপাশি একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, কোন ইমাম যদি তার কোন সমস্যার কারণে বসতে না পারেন তাহলে তিনি জুমুআর প্রথম খুতবা দেওয়ার পর কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর সানী খুতবা প্রদান করতে পারেন। যেমনটি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার ফলে নীচে বসতে না পারার কারণে করতেন। তখন তিনি প্রথম (জুমুআর) খুতবা প্রদানের পর কিছুক্ষণের জন্য নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতেন এরপর সানী খুতবা পাঠ করতেন। একইভাবে আমার পিত্তের অপারেশনের পর প্রথম যে জুমআ ছিল, সেই খুতবার সময় আমিও একই রীতি অবলম্বন করেছিলাম, অর্থাৎ কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে সানী খুতবা পাঠ করেছিলাম।

প্রশ্ন: জামা'তের একজন কর্মকর্তা হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে আহমদী মেয়েদের অ-আহমদী এবং অ-মুসলমান পুরুষদের বিয়ে করার অনুমতি লাভের ক্ষেত্রে উৎকণ্ঠা এবং ব্যাকুলতা প্রকাশ করে এ সম্পর্কে নির্দেশনা কামনা করেন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখের পত্রে এ বিষয়ে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করেন। হুযূর বলেন: ইসলামের কোন কোন আদেশ-নিষেধ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত, যাতে আল্লাহ্ তা'লা সাধারণ মুসলমানদের কোনরূপ পরিবর্তনের বা হস্তক্ষেপের অধিকার দেন নি কিন্তু তাঁর নবী এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত খলীফাদের এক্ষেত্রে পরিবর্তন করার এবং অবস্থানুসারে সিদ্ধান্ত প্রদানের অধিকার দিয়েছেন।

আমার মতে, মুসলমান নারী-পুরুষের অ-মুসলমানদের বিয়ে করার বিষয়টিও এ ধরনের ব্যবস্থাপনাগত বিষয়ের একটি। কাজেই, আহমদী পুরুষ হোক বা নারী তার কোন অ-আহমদী অথবা অ-মুসলমানকে বিয়ে করার অনুমতির বিষয়টি যুগ-খলীফার সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে, অন্য কারও এই অধিকার নেই। যুগ-খলীফা প্রতিটি ক্ষেত্রে অবস্থানুসারে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। কাজেই, অনুমতির জন্য যখন আমার সাথে যোগাযোগ করা হয় তখন আপনার দায়িত্ব হল নিজের মতামতসহ আমার কাছে রিপোর্ট প্রেরণ করা। আপনাদের এর চেয়ে বাড়তি কোন দায়িত্ব নেই।

প্রশ্ন: গত ২৯ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সাথে আতফালুল আহমদীয়া জার্মানির ভার্চুয়াল সাক্ষাতানুষ্ঠানে এক তিফলের এই প্রশ্ন অর্থাৎ, করোনা ভাইরাসের জন্য বর্তমানে যে টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে, এটি আমাদের দেওয়া উচিত কী-না?

হুযূর আনোয়ার (আই.) এর উত্তরে বলেন: যদি এটি প্রমাণ হয় যে, এটি উত্তম চিকিৎসা পদ্ধতি আর সরকার যদি দিতে বলে তাহলে দাও; এতে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু প্রথমে এটি পরীক্ষিত হওয়া উচিত যে, যারা এই টিকা দিয়েছেন তাদের কোন উপকার হয়েছে কি-না? কেবল সুঁইয়ের গুঁতো খাওয়ার জন্য আবার টিকা দিতে যেও না। যদি উপকার হয়, তাহলে অবশ্যই দেওয়া উচিত, কোন সমস্যা নেই।

প্রশ্ন: এই একই মোলাকাতে আরেকজন তিফল জিজ্ঞেস করে, হুযূর! এতো কাজ আপনি একসাথে কীভাবে করেন?

হুযূর আনোয়ার (আই.) এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন: প্রথম কথা হল, যদি সময় পাওয়া যায় তাহলে নিজের দিনের কাজ দিনে-ই শেষ করার অভ্যাস করা উচিত। দ্বিতীয়ত, কোন কোন কাজ এমন আছে যা একত্রে দুটিও করা যায়। যেমন, আমি যখন কারও কথা শুনি তখন পাশাপাশি যদি কোন চিঠিও পাঠ করি তাহলে একই সময়ে দুটি কাজ করতে পারি। এভাবেই অল্প সময়ে বেশি কাজ করা সম্ভব। এছাড়া মানুষকে নিজের কাজ শেষ করার সংকল্প করা উচিত। কাজ শেষ করার সংকল্প থাকলে মানুষ মনোযোগ দিয়ে কাজ করে, ফলে কাজ শেষ হয়। তোমরাও যদি পরিশ্রম করো তাহলে তোমাদের কাজও শেষ হবে। তোমরা যদি পরিশ্রম করার অভ্যাস রপ্ত করো তাহলে তোমরাও এভাবে করতে পারবে, এটা কোন বড় বিষয় নয়।

প্রশ্ন: এই মোলাকাতেই আরেকজন তিফল নিবেদন করে, হুযূর! আপনি আপনার জুমুআর খুতবা কীভাবে প্রস্তুত করেন?

হুযূর আনোয়ার (আই.) এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন: কিছু বিষয় আছে যা গবেষণার দাবি রাখে, উদাহরণস্বরূপ বর্তমানে আমি সাহাবীদের ইতিহাস বর্ণনা করছি। এক্ষেত্রে আমার সাথে যে রিসার্চ টীম আছে তারা আমাকে উদ্ধৃতি ইত্যাদি খুঁজে বের করে দেয়। কিন্তু কোন কোন খুতবা এমন আছে

যা সাধারণত তাহরীকে জাদীদ, ওয়াকফে জাদীদ কিংবা তরবীয়ত সম্পর্কে আমি প্রদান করি; এর জন্য আমি নিজেই পবিত্র কুরআনের কোন না কোন আয়াত নির্বাচন করি এরপর এর তফসীর বা ব্যাখ্যা করার জন্য আমি নিজেই স্বহস্তে পুরো খুতবা প্রস্তুত করে নিই। এক্ষেত্রেও যদি কোন উদ্ধৃতির প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে এই রিসার্চ টীম আমাকে সাহায্য করে। অনেক সময় আমি নিজেই সকল উদ্ধৃতি খুঁজে বের করি আবার কখনও কখনও আমার টীমকে বলি যে, আমাকে অমুক অমুক উদ্ধৃতি খুঁজে বের করে দাও। এরপর সেই অনুসারে আমি খুতবা প্রস্তুত করি।

প্রশ্ন: এই একই মোলাকাতে আরেকজন তিফল জানতে চায়, আমরা বেহেশতে যাবো না-কি দোযখে যাবো তা কি আল্লাহ্ তা'লা আগে থেকেই জানেন? আর তিনি যদি জানেনই তাহলে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কী?

এর উত্তরে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: দেখো! একটি হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লার জ্ঞান আর আরেকটি হল আমাদের কর্ম। আল্লাহ্ তা'লা জানেন যে, অমুক ব্যক্তি দোযখে যাবে কিন্তু তারপরও আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক ব্যক্তিকে পথ বাতলে দেন যে, তুমি যদি এই কাজ করো তাহলে জান্নাতে যাবে। এগুলো হল মন্দকর্ম, এগুলো করলে দোযখে যাবে। ।

এজন্যই আল্লাহ্‌র কাছে শুভ পরিণামের জন্য দোয়া করা উচিত। অর্থাৎ, আমাদের মৃত্যুর সময় যখন আসবে তখন আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলির ওপর যেন আমাদের ঈমান থাকে, যাতে আমরা জান্নাতে যেতে পারি। অথবা আমাদের এরূপ চেষ্টা অবশ্যই থাকতে হবে। পবিত্র কুরআনও আমাদেরকে দোয়া শিখিয়েছে, আমাদের মৃত্যুর সময় যেন আল্লাহ্ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। অতএব, এটিই উদ্দেশ্য অর্থাৎ আমরা তখনই জান্নাতে যাই আর আমরা আল্লাহ্ তা'লার সন্তোষভাজন হই। বাকী আল্লাহ্ তা'লার রহমানিয়্যত রয়েছে, তিনি চাইলে কাউকে ক্ষমাও করে দেন। একজন সম্পর্কে রেওয়ায়েতে এসেছে, সে অনেক গুনাহ্‌গার বা পাপী ছিল, সে অগণিত মানুষকে খুন করেছিল, নিরানব্বই জনকে হত্যা করেছিল। (হঠাৎ) তার স্মরণ হল, আমি অনেক খারাপ মানুষ; আমার আত্মসংশোধন করা উচিত যাতে আল্লাহ্ তা'লা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং আমি জান্নাতে যেতে পারি। (এই ভেবে) সে একজন মৌলভীর কাছে যায় এবং তাকে বলে, আমি এতগুলো খুন করেছি, চরম পাপী! আমি কি জান্নাতে যেতে পারবো? সে বলে, না না! তুমি জান্নাতে যেতে পারবে না; তুমি দোযখে যাবেই যাবে। একথা শুনে সে তাকেও হত্যা করে আর বলে, আগে নিরানব্বই জনকে হত্যা করেছি আর এখন আরেকটি করলে শতক পূর্ণ হবে। (এই) হত্যাকাণ্ডের পর সে আবার অন্য আরেকজনকে জিজ্ঞেস করে, ভাই! এমন কোন উপায় আছে কি যদ্বারা আমি আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করতে পারবো? তিনি বলেন, অমুক শহরে এক ব্যক্তি আছেন, তিনি তোমাকে সঠিক পথ বাতলে দিতে পারবেন, তার কাছে যাও। (একথা শুনে) সেখানে যাওয়ার সময় সে পথিমধ্যেই মারা যায়। সে যখন মারা যায় তখন আল্লাহ্ তা'লা সেই শহরকে যে শহর থেকে সে হত্যা করে বের হয়েছিল সেটি তার থেকে দূরে সরিয়ে দেন আর যেদিকে সে যাচ্ছিল সেটিকে তার নিকটবর্তী করেদেন। (এখানে আল্লাহ্ তা'লা একটি রূপক ভাষা ব্যবহার করেন।) এরপর ফেরেশ্‌তাদের বলেন, যাও এবং যাচাই করে বলো, এর বিষয়ে তোমাদের মতামত কী? দুজন ফেরেশতা আসেন, একজন দোযখে নিয়ে যাওয়ার জন্য আরেকজন বেহেশ্‌তে নিয়ে যাবার জন্য। এ পর্যায়ে উভয় ফেরেশ্‌তার মধ্যে বিবাদ দেখা দেয়। দোযখে নিয়ে যাবার ফেরেশ্‌তা বলছিল, এই ব্যক্তি একশ' জনকে হত্যা করেছে, আমি আল্লাহ্ তা'লাকে বলে একে দোযখে নিক্ষেপ করবো। আর জান্নাতে নিয়ে যাবার ফেরেশ্‌তা বলছিল, না! আল্লাহ্ তা'লা আমাকে পাঠিয়েছেন যেন আমি এসে এর পথ মেপে দেখি। সে বলে, আচ্ছা! এরপর সিদ্ধান্ত হয় যে, আমরা দূরত্ব মাপবো, যদি সে ঐ শহরের নিকটবর্তী থাকে যেখানে সে নিজের পাপ ক্ষমা করানোর উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল, তাহলে সে জান্নাতে চলে যাবে কিন্তু সে যদি সেই শহরের নিকটে থাকে যেখান থেকে সে হত্যা করে রওয়ানা দিয়েছিল- তাহলে সে দোযখে যাবে। এরপর যেমনটি আমি বলেছি, আল্লাহ্ তা'লা সেই দূরত্ব কমিয়ে দেন। এরপর যখন দূরত্ব মাপা হয় তখন দেখা যায় যে, সে ঐ শহরের অধিক নিকটে পৌঁছে গিয়েছিল যেখানে সে পাপ ক্ষমা করানোর উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। আর মাত্র এক বিঘত দূরত্ব ছিল, এক হাতের (দূরত্ব) ছিল। (এ সময় হুযূর আনোয়ার নিজের হাতের বিঘত বানিয়ে আতফালকে দেখিয়ে বলেন,) সেদিকে কেবল এতটুকু দূরত্ব কম ছিল আর অপরদিকে বেশি ছিল। এরপর আল্লাহ্ তা'লা তাকে ক্ষমা করে দেন এবং জান্নাতে নিয়ে যান। কাজেই, এটি হল আল্লাহ্ তা'লার রহমানিয়্যত বা অপার দান। আরেকটি রেওয়ায়েতও আছে, এক ব্যক্তি কাউকে (বা কোন পুণ্যবানকে) বলে, আমি কি ক্ষমা লাভ করবো? সে বলে, না! তুমি অনেক গুনাহ্‌গার বা চরম পাপী, তুমি ক্ষমা পেতে পারো না। তখন আল্লাহ্ তা'লা সেই পুণ্যবান ব্যক্তি যে অনেক নামায পড়তো, নিজেকে অনেক বড় পুণ্যবান মনে করতো তাকে বলেন, কে জান্নাতে যাবে আর কে দোযখে যাবে এই সিদ্ধান্ত প্রদানের তুমি কে? এরপর নিয়তির বিধান অনুসারে উভয়ে একই সময়ে মারা যায় এবং এরপর যখন আল্লাহ্ তা'লার সমীপে উপস্থিত হয় তখন আল্লাহ্ তা'লা সেই পুণ্যবানকে বলেন, (যে পাপী ব্যক্তিকে বলেছিল যে, তুমি দোযখে যাবে আর আমি জান্নাতে যাবো, আমার নিশ্চয়তা আছে।) তুমি নিশ্চয়তা কোথা থেকে পেলে? চলো আমি তোমাকে দোযখে নিক্ষেপ করছি আর তুমি যাকে বলছিলে যে, (তুমি) দোযখে যাবে এবং জান্নাতে যাবে না- তাকে আমি জান্নাতে প্রেরণ করছি। এটি হল আল্লাহ্ তা'লার রহমানিয়্যতের (বা দয়ার বহিঃপ্রকাশ)। তাই, আমাদের কাজ হল, আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করার জন্য চেষ্টা করতে থাকা। আল্লাহ্ তা'লা সবকিছু জানেন ঠিকই কিন্তু তিনি সবকিছুর ওপর কাদের বা পূর্ণক্ষমতাবানও বটে। আল্লাহ্ তা'লা রহমানও, তাঁর রহমানিয়্যত বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'লা গফূর অর্থাৎ ক্ষমাশীলও বটে। কাজেই, চূড়ান্ত পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে, তকদির বা নিয়তিকে পাল্টেও দিতে পারেন। তিনি যেহেতু সকল শক্তির আধার তাই তাঁর মাঝে স্বীয় সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার ক্ষমতাও রয়েছে। তাই তুমি যদি বলো যে, আল্লাহ্ তা'লা সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন, আমাদের যেহেতু দোযখেই যেতে হবে তাই চলো পাপ করতে থাকি, কি আর হবে! অমুক কাজ করতে থাকো, হারাম বা অবৈধ বস্তু খেতে থাকো, মদ পান করতে থাকো এবং পাপ করতে থাকো, কি আর হবে? এত কিছু করে ফেলেছি, (এখন) আল্লাহ্ আর আমাদের ক্ষমা করবেন কীভাবে? (কিন্তু) আল্লাহ্ তা'লা বলেন, না! চেষ্টা করো আর চেষ্টা করতে থাকো, একেবারে শেষ মুহূর্তে গিয়েও আমি তোমাদের ক্ষমা করতে পারি। তাই চেষ্টা করা উচিত যেন শুরুতেই আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ক্ষমা করে দেন, এরপর মানুষ যেন এই প্রার্থনা করে, "আমার পরিণাম যেন শুভ হয় আর আমি শেষ পর্যন্ত যেন পুণ্যই করতে থাকি।" কাজেই, আমাদের চেষ্টা করতে থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার অধিকার বা ক্ষমতা আছে, তাই নয় কী? আল্লাহ্ তা'লা মালিক বা অধিপতি, সবকিছুর ওপর তিনি পূর্ণ কর্তৃত্ব রাখেন। তিনি অবশেষে তোমাকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন। তুমি বলবে যে, আমার তকদিরের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, আমি পাপী। (কিন্তু) আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি যদি একশজনের খুনিকেও ক্ষমা করে দিতে পারি তাহলে তোমাকেও ক্ষমা করতে পারবো।

প্রশ্ন: লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র একজন সদস্যা বলেন- কুরআন করীমের সূরা তাগাবুন -এর ১৫ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন-'হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের স্ত্রী ও তোমাদের সন্তানদের মধ্য থেকে কতক তোমাদের শত্রু। অতএব, তোমরা তাদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকিও। আমার প্রশ্ন হল, এখানে কেন স্ত্রী সন্তানদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, স্বামীর উল্লেখ করা হয় নি কেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আসলে এখানে কুরআন করীমে 'আজওয়াজুকুম ও আওলাদুকুম' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আজওয়াজ বলতে কেবল স্ত্রীদেরকে বোঝায় না। আমার মতে আজওয়াজ এর অর্থ স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই। স্বামী সৎ না হলে স্ত্রীদের সতর্ক থাকা উচিত, তার গতিবিধি লক্ষ্য রাখা উচিত এবং সে ইসলাম ও আহমদীয়াতের বিরোধি কি না তা জানার চেষ্টা করা উচিত। এটা আমার দৃষ্টি ভঙ্গি। (যদিও) এর অনুবাদ করা হয়েছে স্ত্রী ও সন্তান। কিন্তু আরবীতে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার অর্থ জীবনসঙ্গী। আর জীবনসঙ্গী উভয়েই হতে পারে। আমরা কেন এখানে স্ত্রী শব্দ ব্যবহার করি তা জানার চেষ্টা করলে আমি জানতে পারি যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) -এরও একই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, অর্থাৎ জীবনসঙ্গী। তিনি উর্দুতে এর অনুবাদ করেছেন 'আজওয়াজ', স্ত্রী নয়। এইরূপে এর অনুবাদ দাঁড়ায় তোমাদের জীবনসঙ্গী এবং সন্তান-সন্ততি। তাই আপনি যদি জীবনসঙ্গী (Spouse) শব্দ ব্যবহার করেন তবে কোন প্রশ্নই থাকে না। অতএব, প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। অনেক সময় স্বামীরা আপনাদের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, যদি তারা ইসলাম আহমদীদের শিক্ষার বিরুদ্ধে আমল করার বিষয়ে বলে। অনেক সময় পুরুষদের উপর কিছু কিছু মহিলার বেশি প্রভাব থাকে, এর বিপরীতে অনেক সময় দেখা গেছে কোন কোন স্ত্রীর উপর পুরুষদেরও বেশি প্রভাব থাকে। তাই আমি মনে করি, যিনি এই আয়াতের অনুবাদ করছিলেন, তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। সেযুগে মহিলারা ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অতটা ওয়াকিবহাল ছিল না। কিন্তু এখন আপনারা শিক্ষিত হয়ে উঠেছেন। আপনারা কুরআনের অনুবাদ জানেন,

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-9 Thursday, 30 May, 2024 Issue No.22

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

কুরআন পড়তে পারেন। আপনারা এখন ইসলাম আহমদীয়াতের ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন, আপনাদের কাছে তথ্য ও জ্ঞান আছে। অনেক সময় আমাদের মেয়েরা ছেলেদের থেকে বেশি শিক্ষিত হয়। এখানে এই প্রেক্ষাপটে এটা বলা যেতে পারে যে, নিজেদের স্বামী ও সন্তানদের বিষয়ে সতর্ক থাক।

আরও এক লাজনা সদস্যা প্রশ্ন করেন, সংকটকালে মানুষের আত্মীয় স্বজন ও নিকটজনেরা তাদের থেকে দূরে সরে গেছে, তারা চাকরি হারা হয়েছেন, বা কাজ পরিবর্তন করতে হয়েছে, উপার্জনের পার্থক্য এসেছে। এমতাবস্থায় মানুষ কিভাবে আল্লাহ্ তা'লার উপর আস্থা রাখতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: যখন আপনার কাছে বেশি কাজ থাকে আর আপনি জাগতিক কর্মকাণ্ডে মগ্ন থাকেন, নিজের কাজে ব্যস্ত থাকেন, তখন সাধারণত দেখা যায় যে মানুষ নামাযের দিকে বেশি মনোযোগ দেয় না। আমি তো এটাকে উল্টো দিক থেকে দেখি যে, মানুষ যখন কোন বিপদে পড়ে তখন সে আল্লাহ্‌র নিকট সিজদাবনত হয়। অতএব, এখনই সেই সময় যখন কি না আপনাকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়া দরকার। নিজেদের নামায যথাক সময়ে পড়ুন এবং আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া করুন যে, তিনি যেন সমস্ত বিপদাপদ ও সমস্যাবলী দূর করে দেন আর আপনি সেই কঠিন সময় পেরিয়ে আসতে সফল হন। তাই আমার মতে আপনাকে আরও বেশি অবিচলতা প্রদর্শন করা উচিত। আপনার কাছে যখন ভাল চাকরি থাকে, আপনার উপার্জন ভাল হয়, জাগতিক কাজকর্মে বেশি ব্যস্ততা থাকে, তখন সচরাচর আমরা দেখতে পাই যে, মানুষ ভুলে যায় যে, খোদা কে আর কখন ইবাদত করা উচিত। মানুষ খোদা তা'লাকে ভুলে যায়। দেখুন, ইহজগতে আমাদের অভিজ্ঞতা, যারা জাগতিক বিষয়াদিতে নিমজ্জিত তারা সাধারণত আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মনোযোগ দেয় না। এই কারণেই পশ্চিমা দেশগুলিতে নাস্তিকতার প্রসার ঘটছে। কেননা তারা মনে করে, তারা যা কিছু করছে তা নিজেদের যোগ্যতা, শিক্ষা, জ্ঞান এবং তাদের আর্থিক সচ্ছলতার জোরে করছে। আমরা সাধারণত এটাই দেখতে পাই যে, বস্তুবাদিরা আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করে না আর আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলী মেনে চলারও চেষ্টা করে না। বরং যারা দারিদ্র পীড়িত তারা বেশি করে আল্লাহ্ তা'লার দিকে মনোযোগ দেয় আর আপনি যদি এখন মনে করেন যে, আপনি কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন আর এই অঙ্গীকারও করেন যে, যখনই আপনার অবস্থা স্বাভাবিক হবে তখন আপনি কোনওভাবেই নামাযে অনুনয় বিনয় করা ত্যাগ করবেন না। তাই এটাই সময় আল্লাহ্‌র কাছে বেশি করে কান্নাকাটি করার। আপনি যখন কোন বিপদে পড়েন, যখন আপনার সন্তান অসুস্থত হয় তকন আপনি আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করেন, আপনি যখন নিজে কোন সমস্যায় নিপতিত হন বা অসুস্থ হন তখন আল্লাহর কাছে নিজের আরোগ্যলাভের জন্য দোয়া করেন। তাই আমরা কিভাবে দোয়া করব আর আল্লাহ্ তা'লার অধিকার কিভাবে পূরণ করব তা প্রশ্ন করার পরিবর্তে এটাই সময় যখন আপনার দোয়া করা উচিত।

পুরুষদের মধ্য থেকে একজন প্রশ্ন করেন যে, আফ্রিকা মহাদেশ পুনরায় একের পর এক যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিদ্রোহে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। আফ্রিকার নেতাদের জন্য প্রিয় হুযুর কি উপদেশ দান করবেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: পৃথিবীর কোন প্রান্ত এই সব থেকে মুক্ত নয়। কেবল আফ্রিকাই নয়, আমরা পৃথিবীর সর্বত্রই একই জিনিস দেখতে পাই। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইউরোপের পরিস্থিতি আফ্রিকার চায়তে বেশি ভয়াবহ। কেননা, এই পরিস্থিতি সারা পৃথিবীকে গ্রাস করতে পারে। আমি কয়েক বছর থেকে বলে আসছি যে, দেশ ও সমাজের শান্তির জন্য ন্যায় এর প্রয়োজন, বা বলা ভাল পরিপূর্ণ ন্যায়ের প্রয়োজন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের নেতৃত্ব নিজেদের কাজে জনগণের জন্য সততা ও ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন না করে, আমরা সমাজে শান্তি বজায় রাখতে পারব না, এগুলো ঘটতেই থাকবে। আপনারা দেখবেন,যেখানে নেতারা সৎ, জনগণের প্রতি আন্তরিক, সেই সব দেশগুলি উন্নতি করছে বা কিছুটা হলেও উন্নতি করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আফ্রিকায়, বরং এশিয়া ও ইউরোপের অনেক দেশকে দেখতে পাই যাদের নেতারা সৎ নন। তাই আমরা দোয়া করি যে আর সেই সব নেতাদের কাছে আবেদন করি যে, তারা নিষ্ঠা ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হোন এবং নিজেদের প্রকৃত স্রষ্টাকে সনাক্ত করে। এবং এ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের কর্মকাণ্ড দেখছেন, যা কিছু তারা করছে এর জন্য ইহজগতে না হলেও পরকালে তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। তবেই তারা ভাল কাজ করবে। অতএব, আমাদেরকে তাদের মধ্যে এই চেতনা সৃষ্টি করতে হবে যে, একজন খোদা আছেন। আর তারা যেন এমনটা না মনে করে যে, ইহজগতই সব কিছু। বরং তারা পরকালে নিজেদের কর্মের জন্য জিজ্ঞাসিত হবে। আর যা কিছু দায়িত্ব আপনার উপর অর্পিত হয়েছে, সেগুলো আপনাদের প্রশ্ন করা হবে। আর যদি আপনি নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করেন তবে আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে শাস্তি দিবেন। অতএব, এটিই একমাত্র বিষয় যা তাদের সংশোধন করতে পারে। যখনই আমি এই সব নেতাদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাই, আমি সব সময় এই কথাটা বলে আসছি যে, সব সময় মনে রাখবেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দেখছেন। আমরা যদি এই সত্যকে অনুধাবন করতে সক্ষম হই তবে ভাল, অন্যথায় এই ধারা অব্যাহত থাকবে। আমরা কেবল দোয়াই করতে পারি বা চেষ্টা করতে পারি যেন সমস্ত দেশ ও মহাদেশ প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ করে। যেমনটি আপনাদের সামনে করা তিলাওয়াতে শুনেছেন যে, আপনারা এক জাতি সত্তায় পরিণত হন এবং একে অপরের সঙ্গে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ করুন। এবং হুকুকুল্লাহ্ হুকুকুল ইবাদের দাবি পূর্ণ করুন। এটিই একমাত্র সমাধান, অন্যথায় কোন প্রকার সংশোধনের আশা অবশিষ্ট নেই।

(১ম পাতার পর.....)

হল হে খোদা! তোমাকে আমার ভালবাসার দোহাই! তুমি আমাকে অন্তরালে রাখ। অর্থাৎ আমার অস্তিত্বকে মিটিয়ে তোমার অস্তিত্ব যেন আমার মাধ্যমে প্রকাশিত হতে থাকে। আর একথা স্পষ্ট যে বান্দার মাধ্যমে যতবেশি খোদা তা'লার অস্তিত্ব প্রকাশিত হবে, ততবেশি সে নিজের সৎ উদ্দেশ্যসমূহে সফল হবে।

তবে এই শব্দটি যখন অন্য কারো জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন তাদের মর্যাদা অনুসারে এর অর্থ হবে। একজন উচ্চ পদমর্যাদার মোমেন যখন এই শব্দটি ব্যবহার করে তখন এর অর্থ হবে, যে দুর্বলতা পুণ্যের পরাকাষ্ঠা লাভে মানুষকে বঞ্চিত রাখে, তা থেকে আমাকে রক্ষা কর। মধ্যম মানের মোমেনের জন্য যখন এই শব্দ ব্যবহৃত হয়, তখন এর অর্থ হবে, আমার দোষত্রুটি গোপন রেখে আমাকে উচ্চমানের উন্নতি করার তৌফিক দাও। আর একজন সাধারণ মোমেন যখন এই শব্দ ব্যবহার করে, তখন এর অর্থ হবে, আমাকে ঈমানের উপর অবিচল রাখ, পাছে আমার পাপসমূহ আমাকে না ডুবায়। আর একজন সত্যসন্ধানী ব্যক্তি যখন এই শব্দটি ব্যবহার করে, তখন এর অর্থ হবে, আমার পাপসমূহ আমাকে হিদায়াত লাভ থেকে বঞ্চিত না রাখে, অতএব, তুমি আমার পাপসমূহ ক্ষমা কর। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই শব্দটির প্রয়োগ ঠিক তেমনই, যেমনটি 'জাব্বার' শব্দ। যখন এটি আল্লাহ্‌র জন্য ব্যবহৃত তখন এর অর্থ সংস্কারক আর এই একই শব্দ যখন মানুষের জন্য ব্যবহৃত হয়,তখন এর অর্থ অবাধ্য ও আইন অমান্যকারী। স্মরণ রাখা দরকার, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবীদের সম্পর্কে বলেছেন- 'আল্লাহু ইয়াজতাবি মির রসুলিহি। কাজেই আল্লাহ্ তা'লা যখন তাদেরকে মনোনীত করেন, সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যে পাপ কোথা থেকে আসবে? তাদেরকে যখন পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে খোদার নিকট বসানো হয়েছে,তবে তাদের কাছে শয়তান কোথা থেকে আসবে? শয়তান তো খোদার নাম শুনেই পালিয়ে যায়। অনুরূপভাবে অন্যত্র বলা হয়েছে إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ- অর্থাৎ নিশ্চয় আমার বান্দাদের উপর তোমার জোর খাটবে না। কাজেই এটিই যখন নিয়ম যে, আল্লাহ্ সেই ব্যক্তিকেও শয়তানের আধিপত্য থেকে রক্ষা করে যে উবুদিয়াতের অতি সাধারণ মানে রয়েছে, সেক্ষেত্রে আম্বিয়া যেখানে আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ নিরাপত্তার অধীনে থাকেন, তাদের কাছে শয়তান কিভাবে পৌঁছবে?

(তফসীরে কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৮৯)

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir